ঃ তৃতীয় অধ্যায় ঃ

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ঃ
রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার

তিস্তাপুরাণ ঃ
রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার

তৃতীয় অধ্যায়

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণের রচনারীতি

বাংলা সাহিত্য ধারায় উপন্যাস হল নবতর সংযোজন। প্রকৃতপক্ষে প্রায় দেড়শ' বছর ধরে এই সাহিত্য শাখাটি পুষ্টি লাভ করেছে। ইংরেজি নভেলকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে এর সূচনা ও বিকাশ। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিকদের হাতে বার কয়েক ইংরেজি মডেল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা হলেও সফল হয়নি। বাঙালীর নিজস্ব গল্প কথনের যে রীতি মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারতাদি নানা পুরাণ, রূপকথা, কথকতা, ব্রত-পাঁচালিতে আছে বাংলা উপন্যাসে সে রীতি ছিল অনুপস্থিত। সতীনাথ ভাদুড়ি তাঁর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' এ ইংরেজি মডেলমুক্ত নতুন ধারার সার্থকতা অনেকখানিই দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে দেবেশ রায় বলেছেন—

" 'রামচরিতমানস' এর কাহিনীর আদলে অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি পথের ছেলেকে নিয়ে যে উপন্যাসিক বিবরণ সতীনাথ তৈরি করলেন তাতে আমাদের বাংলা উপন্যাসের স্বীকৃত ফর্ম প্রত্যাখ্যাত হল আর প্রস্তাবিত হল কাহিনীর এক নতুন বিন্যাস।" ১

দেবেশ রায় তাঁর দুই যুগান্তকারী উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'এ ইউরোপিয় মডেল থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছেন। বাংলার নিজস্ব গল্প বলার রীতিকে আত্মস্থ করে জন্ম দিয়েছেন এক নবতম আধুনিকতার।

এই আধুনিকতা ও স্বাতন্ত্র্য উপন্যাস দুটির গঠনরীতিতে, ভাষা শৈলীতে উপমা, প্রবাদ, ছিলকা, ফাকালি ইত্যাদি প্রয়োগে এক 'লোকায়তিক পৌরুষ' এনে দিয়েছে, যা বাংলা উপন্যাসে অভিনব।

দেবেশ রায় দেশজ আখ্যানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট পরিণামে আখ্যান শেষ না করে কালপ্রবাহের মতো আখ্যানের নিজস্বগতি সৃষ্টি করেছেন। এই এগিয়ে চলার অর্থ সব ক্ষেত্রে যে সামনে চলা তা নয়। একটি কথাবৃত্তের সূত্র ধরে আর একটি কথাবৃত্তে এসে যাওয়া; সব সময় বাস্তবের যৌক্তিক পারম্পর্য মেনে চলা নয়। বাস্তবতা তার কাছে এক আবশ্যিক উপাদান হলেও এর কোনো সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় আকার প্রকার নেই। বাস্তবকেও তিনি গড়ে নিয়েছেন নিজের মতো করে।

প্লট পরিকল্পনায় তিনি আদি-মধ্য-অন্ত্যরীতিকে ভেঙ্গে ফেলেছেন। সমগ্র উপন্যাসটিকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করে আকার দিয়েছেন। এই পর্বগুলি আবার কতকগুলি ছোট ছোট অধ্যায় বা এপিসোডে বিভক্ত। এপিসোডগুলি পৃথক পৃথক ভাবে সম্পূর্ণ। আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোনো কোনো এপিসোড আপাত সম্পর্কহীন,

এলোমেলো। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সম্পর্কশূন্য নয়।

এদেশের পুরাণ কথায়, মহাকাব্যে যেমন আখ্যানের মধ্যে আখ্যান ঢুকে থাকে; একটি কথাবৃত্তের পাশাপাশি আর একটি কথাবৃত্ত চলতে থাকে; যে কোন বিন্দু থেকে বেরিয়ে আসতে পারে আর একটি কথাবৃত্ত; কথকতায় যেমন কথক মূল গান থামিয়ে দিয়ে অন্য গল্প, তত্ত্ব কথা, উপদেশ কিছু বিবরণ শুরু করেন—আবার ফিরে এসে খেই ধরেন, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে তা দেখা যায়।

উপন্যাস অনুসরণে রচনারীতি ও রচনা স্বরূপ আলোচনা করা হলো—

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত :

উপন্যাসটি ছ'টি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি যথাক্রমে আদি পর্ব, বনপর্ব, চরপর্ব, বৃক্ষপর্ব, মিছিলপর্ব ও অন্ত্যপর্ব। পর্বগুলিকে বিষয় চিহ্নিত করার জন্য নামকরণও করা হয়েছে। যেমন আদিপর্ব—গয়ানাথের জোতজমি, বনপর্ব—বাঘারুর নির্বাসন, চরপর্ব—নিতাইদের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্ত বাহিনীর সীমান্ত ত্যাগ; বৃক্ষপর্ব—বাঘারুর প্রত্যাবর্তন, মিছিল পর্ব—উত্তরখন্ডের স্বতন্ত্র রাজ্যদাবি, অন্ত্যপর্ব—মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র। ছ'টি পর্বের পর একটি পরিশিষ্ট অংশ যুক্ত করা হয়েছে। তারও একটি শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ।'

পুবে ডায়না থেকে পশ্চিমে তিস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত তিস্তাপারের রাজবংশী মদেশিয়া, ভাটিয়া, ওরাওঁ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিশ্বাস, ভাষা সংস্কৃতি কীভাবে তিস্তা অন্বিত তাই আলোচিত হয়েছে তিস্তাপারের বৃত্তান্তে।

শিরোনামযুক্ত পর্বগুলি বেশ কয়েকটি শিরোনামযুক্ত এপিসোড বা অধ্যায়ে বিভক্ত। যেমন, আদিপর্ব—'গয়ানাথের জোতজমি' তে ১. হাটের পথে ২. ন্যাওড়া নদীর খেয়া ৩. সত্যমেব জয়তে ইত্যাদি মোট একচল্লিশটি এপিসোড বা অধ্যায় রয়েছে। এভাবে বনপর্ব 'বাঘারুর নির্বাসন' তে মোট চুয়াল্লিশটি, 'চরপর্বে' চৌত্রিশটি, 'বৃক্ষপর্বে' তেত্রিশটি, 'মিছিলপর্বে' আটত্রিশটি, 'অন্ত্যপর্বে' আঠাশটি এপিসোড। পরিশিষ্টকেও একটি এপিসোড ধরা যেতে পারে।

পর্ব ও এপিসোডগুলি প্রত্যেকটিই পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমনকি পর্বগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পূর্ণ বা আংশিক পৃথক ও স্বাধীন ভাবেও প্রকাশিত হয়েছিল। '১৯৮০ ও ৮১ শারদীয় 'বারোমাস' এ আদি ও বনপর্ব ৮৪ ও ৮৬-র শারদীয় 'কালান্তর'-এ চরপর্বের অংশ বিশেষ ও ৮৭-র শারদীয় 'প্রতিক্ষণ' এ অন্ত্যপর্ব

প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।' প্রতিক্ষেত্রেই পাঠক পর্বগুলির পৃথক পৃথক স্বাদ অনুভব করেছেন।

এভাবে আলাদা আলাদা পর্ব জুড়ে এক সময় তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ পাঠককে শুধু বিস্মিতই করে না, উপন্যাস রচনার এই নতুন কৌশল, লেখকের অপরিসীম দক্ষতা, মনন ও শিল্পরূপ নির্মাণ পাঠককে মুগ্ধ করে। অতীতে নম্বর দিয়ে অধ্যায়কেচিহ্নিত করার নানা রীতি দেখা গেছে। কিন্তু পর্বের নামকরণ বা এপিসোডের নাম করণ 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'এর আগে দেখা যায় নি।

'হাটের পথে' আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়। এই এপিসোড শুরু হয়েছে 'একই হাটেএকসঙ্গে দুটো সাইন বোর্ড যাচ্ছে এবড় একটা দেখা যায় না।' এই পংক্তি দিয়ে। ক্রান্তির হাটে তিস্তাপারের জমি জরিপের জন্য হল্কাক্যাম্প বসবে সেই হল্কাক্যাম্পের সাইন বোর্ড ও 'কৃত্রিম গো প্রজনন কেন্দ্র' এর আর একটি সাইন বোর্ড যাচ্ছে হাটের দিকে। অধ্যায়টির শেষ পংক্তিগুলো এরকম—"এখন এই রাস্তাটুকু দিয়ে সেই শেষ হাট চলছে। চলতে গেলেই লাইন বাঁধা হয়ে যায়। আর লাইন বাঁধা হয়ে যায় বলেই আকাশের দিকে ফেরানো 'কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র' আর পিঠে ঝোলানো হল্কা ক্যাম্প যেন এই পুরো লাইনটিরই পরিচয় হয়ে উঠতে চায়। যেন, এই পুরো লাইনটাই গিয়ে ঢুকল গো-প্রজননের কৃত্রিম ব্যবস্থায় বা সেটলমেন্টের হল্কা ক্যাম্পে।" ২

যে দুটি সাইনবোর্ড অধ্যায়ের সূচনাতে দেখা গেল অধ্যায়ের শেষে হাটে যাওয়া মানুষের লাইনের পুরোভাগে সেই সাইনবোর্ড দুটি থেকে যেন সমস্ত লাইনটিকেই বিশেষ পরিচয়ে পরিচিত করল। 'হাটের পথের' এই ঘটনার মাঝখানে হাটে যাওয়ার পথ, পথে চলার বাহন, হাটুরেদের পোষাক আশাক, তাদের চলার গতি, কথাবার্তা, জিনিসপত্রের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হাটের পথের শুরু ও শেষ একরকম নয়। শেষ সময়ে সব কিছুতেই ব্যস্ততা, তাই পথ ব্যস্ত মানুষের চলনে লাইন বাঁধা।

"পয়লা হাটত দোকানিয়া বেচে

মাঝ হাটত দেউনিয়া বেচে

শেষো হাটত ঘরুয়া বেচে।" ৩

হাটের পথের ঠাসবুনোট বর্ণনা অবশ্যই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রচনার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই হাটের পথ ধরেই চলে যাওয়া যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ন্যাওড়া নদীর খেয়া' এপিসোডে। এর প্রথম লাইন 'গাছ গাছালি, বনবাদাড়ের ভেতর দিয়ে এই পাকা রাস্তাটা শেষ হয়ে যায় নদীর পাড়ে।' 'হাটের পথে'তে যে রাস্তা দিয়ে সাইন বোর্ড সহ হাটুরেরা যাত্রা শুরু করেছিল তারা সেই রাস্তা ধরে এসে দাঁড়ায় 'ন্যাওড়া নদীর খেয়া' ঘাটে। এভাবে একটার

পর একটা এপিসোড শেষ শুরুর অদ্ভুত মিল রেখে এগিয়ে চলেছে। অথচ এপিসোডগুলির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও বজায় আছে।

আবার এপিসোডগুলির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকে গিয়ে যে পরম্পরা চলছিল তা, খানিকটা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে এমন উদাহরণও আছে। যেমন ছেষট্টি নম্বর এপিসোড 'নির্বাসনের দিকে' তে বাঘারু তার নির্বাসনভূমি ডায়নার চরের দিকে যাত্রা করেছে। এই এপিসোডের শেষ পংক্তি—"বাঘারুর মাথার পেছনে পিঠের ওপরে পাতার গোছা ভাসে, গলায় পাথর ডোবে আর ভোখা বোকার মতই স্রোতে ভেসে থেকে বাঘারু ওপারে, ফরেস্টে, তার নির্বাসনে চলে যায়।" ৪

কিন্তু তারপর, পরপর তিনটি প্রক্ষিপ্ত এপিসোড 'অর্থনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত', 'কৃষি বিজ্ঞানের' কিছু প্রক্ষিপ্ত, 'রাজনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত'। এরপর সত্তর নম্বর এপিসোড 'নির্বাসনভূমি'। 'নির্বাসনের দিকে' 'নির্বাসনভূমি'ই স্বাভাবিক ঘটনা ও স্বাভাবিক গতি। মাঝখানে পরপর তিনটি প্রক্ষিপ্ত, পরস্পরে সম্পর্কযুক্ত এপিসোড এই গতি পথে আপাত সঙ্গতিবিহীন। কিন্তু উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে মোটেই প্রক্ষিপ্ত নয়, সঙ্গতিহীনও নয়। বরং বাঘারুর নির্বাসন ভূমিতে যাওয়ার গল্পের ফাঁকে লেখক আমাদের জানিয়ে দিলেন 'অর্থনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত' অধ্যায়ে সরকারি ফরেস্টের হাল হকিকত্। ফরেস্টে গোরু মোষের বাথান ব্যবস্থা, উত্তরবঙ্গে, ভারতে, এ ধরণের বাথান তৈরির আর্থিক দিক। শুধু তাই নয় ডায়নার চরে যে গো-মোষের বাথানে বাঘারু নির্বাসিত হল এই বাথান চিত্র তারই আগাম উপস্থিতি বলতে পারি। কৃষি বিজ্ঞানের কিছু প্রক্ষিপ্ত' অধ্যায়ে জানা যায় ফরেস্ট ভিলেজাররা চাষবাসে যে আধুনিকতা এনেছে, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করছে তার ফলে ফরেস্টের পরিবেশের সন্তুলন বিনষ্ট হচ্ছে; পশু, পাখি অন্যান্য বন্য জীবজন্তু মারা পড়ছে—এইসব বিবরণ। 'রাজনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত' তে জানা যায় ১৯৬২ সালে চীন ভারত যুদ্ধের ফলে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের বনাঞ্চলে মিলিটারিদের স্থায়ী ক্যাম্প তৈরি হয় এবং তাদের দুধ সাপ্লাই দেওয়ার কাজে বাথানের ভূমিকা খুব জরুরী হয়ে পড়ে। ডায়নার চরে গয়ানাথের বাথান থেকে এ ধরনের দুধ সংগ্রহের বিবরণ 'বনপর্বে' পাওয়া যায়।

বৃত্তান্তর :

'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'র রচনারীতির আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হল বৃত্তান্তর। যে বৃত্তে কথা আলোচিত হচ্ছে সেই বৃত্তে কথা বলতে বলতে আর এক বৃত্তে চলে যাওয়াই হল বৃত্তান্তর। বনপর্বের 'চুরাশি' অধ্যায়ে

লেখক একেবারে ঘোষণা করে বৃত্তান্তরে গেছেন। এই এপিসোডের নামকরণই করা হয়েছে 'পাখোয়ালপর্ব : আর এক বৃত্তান্তের শুরু'।

বাথানে মইষানি একটি বাচ্চা প্রসব করেছে। এই প্রসব কার্যে বাঘারু ধাইয়ের মত রক্ত ক্লেদ ঘেঁটে সহায়তা করেছে। সূর্যগ্রহণ চলছিল। গ্রহণ শেষ হলে দ্বিতীয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল, মোরগের ডাক শোনা যায়। তারই মধ্যে একটি মিলনেচ্ছুক পাখি তার সমস্ত শরীর দিয়ে ডেকে চলে ক-অ-অ-ক্। শুরু হয় পাখোয়াল পর্ব, শুরু হয় আর এক বৃত্তান্ত। এই পাখির ডাকে সারা দিয়ে বাঘারুও পাখির মতো করে ডেকে উঠেছে। "দুটো রক্ত মাখা হাত মুখের কাছে তুলে বাঘারু খুব চাপাস্বরে, গলা না তুলে পাখিটার ডাকে সাড়া দেয়।" ৫ 'একবার, দুবার, বারবার'।

বৃত্তান্তরের আর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্ত্যপর্ব 'মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র'কেও উল্লেখ করা যায়। বাঘারুর বৃত্তান্ত-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য পৃথক বৃত্তান্ত 'মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র'এর অবতারণা করা হয়েছে। মাদারির মায়ের জীবন বৃত্তান্ত ব্যারেজ বৃত্তান্তর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কাহিনির সম্পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে।

কথান্তর ঃ

বৃত্তান্তরের মতো কথান্তর ঘটেছে উপন্যাসের বহুস্থানে। একটি কথা বলার মধ্যেই অন্য কথা এসে কিছুক্ষণের জন্য বক্তব্যকে অন্য দিকে নিয়ে গেছে। বক্তব্য হয়েছে শিল্পিত, স্বাদু। উপন্যাসের ঘটনা, বিষয় নতুন মাত্রা পেয়েছে। যেমন 'আদিপর্বে উনত্রিশ অধ্যায়টি 'জনসমাবেশ' শিরোনামে চিহ্নিত। এতে সার্ভে পার্টিকে ঘিরে উৎসুক আদিবাসী উপজাতি মানুষের ভিড় জমে উঠেছে। মনে হচ্ছে একটা জনসমাবেশ। এই জনসমাবেশের কথা বলতে গিয়ে ফরেস্টের পাশের পতিত জমির কথা লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে কিছুক্ষণের জন্য জনসমাবেশের কথা ভুলে থাকতে হয়। এই ভূমিখন্ডের চমৎকার বর্ণনাই যেন মূল বিষয় হয়ে ওঠে।

"এই রাস্তার মত জমিটার ওপর মোটা মুথাঘাস অসম ভাবে বেড়ে উঠেছে। ফলে কোথাও ঘাসের আস্তরণ খুব পাতলা, তলার মাটিই প্রায় বেরিয়ে পড়েছে। আর কোথাও আস্তরণ এত মোটা, যে বসলে ঘাসে লেগে থাকা জলে পেছনের কাপড় চুপসে যায়। এই রাস্তার মত ডাঙ্গার ওপরটা পরিষ্কার যেন যত্ন করে নিয়মিত পরিষ্কার রাখা হয়। দু-পাশে ডাইনের নিচু জমিটাতে বা বাঁয়ের ছোট নালীর ওপারে বনের গাছ গাছড়ার মধ্যে লম্বা ঘাসের জঙ্গল ঘন ও বড় হয়ে উঠেছে। এসব ঘাসবনে বাঘ থাকে। ঝোপঝাড় জঙ্গলও দুপাশে মাটি কামড়ে, গাছ কামড়ে ছড়িয়েছে, বেড়েছে।" ৬

অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল 'মিছিল পর্বে' একশ ঊনষাট অধ্যায় থেকে। 'একটি প্রয়োজনীয় জীবনী : সংক্ষেপে' নামক এই এপিসোডে বীরেনবাবুর জীবনী আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ময়নাগুড়ি বাড়িতে এই রাজবংশী উকিল তাঁর বাড়ির সামনের জমিতে কিছুটা অংশে কপি চাষ করে। এই কথার সূত্র ধরে কথান্তর ঘটে— "আজকাল অবিশ্যি এদিকে একটা নতুন ব্যবসা চালু হচ্ছে। এরকম বড় জমির ওপর বাড়ি যাদের তাদের কাছে তরকারি চাষীরা এসে ওই বছরের জন্য জমিটা নিতে চায়। সমস্ত খরচ চাষীর। তরকারি যা হবে তার একটা অংশ জমির মালিকের আর কতটা চাষীর তা এখনও স্থায়ী ভাবে স্থির হয়নি, কারণ এক একজন এক এক নিয়মে জমি যদি দেয়, দিতে রাজী হয়। কেউ আধি ভাগে দেয়—তা হলে অবিশ্যি ফলনের খরচাও বারআনি-চারআনি ভাগ হবে। বীরনেবাবুর কাছেও এই প্রস্তাব দিয়ে দু-তিন বছর লোক আসছে।" ৭

এরপর তিনি ধীরে ধীরে সম্পন্ন রাজবংশীদের এই তরকারি চাষের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া, তরকারি চাষিদের আবার শিলিগুড়ির আড়তদার কর্তৃক দাদন দেওয়ার কথা বলেন। এর ফলে এক সময় বহু রাজবংশী পরিবারের ভিটেমাটি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা আসে। ক্রমে যে ময়নাগুড়িতে রাজবংশী বাড়ির সংখ্যা কমে যাচ্ছে এও তার একটি কারণ বলা হয়। এভাবেই চলে আসে অতীতে তিস্তা পার হয়ে জলপাইগুড়ি শহরে যাওয়ার কথা, সেখানে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার কথা, তিস্তা ব্রিজ হওয়ায় অবস্থাটা কিভাবে পাল্টে গেল সে সব কথা। জলপাইগুড়ি শহরে পঁয়ত্রিশ বছর কোর্টে প্র্যাকটিস করার সুবাদে তিনি বেশ ভালোই বুঝতে পারছেন উত্তরবঙ্গের শহরাঞ্চল থেকে রাজবংশীদের সংখ্যালঘু হওয়ার কারণ কী কী।

এভাবে তার নিজের কপিচাষের কথা থেকে কথান্তর ঘটিয়ে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের প্রসঙ্গ চলে আসা দেবেশ রায়ের রচনা রীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এক কথাসূত্রের সাহায্যে অন্য কথা সূত্রে যাওয়ার উদাহরণও হতে পারে এটা।

কথার বিস্তার :

কথান্তরের মতো করেই কথার বিস্তার আর একটি রীতি। একই কথা হয়ত দু এক পংক্তিতেই সমাপ্ত হতে পারে কিন্তু তার বিস্তার ঘটিয়ে উপন্যাসের গঠন, সৌন্দর্য ও শৈল্পিক বিকাশ ঘটানো হয়। যেমন, আদিপর্বে 'এই হাটটা কেমন' অধ্যায়ে ধূপগুড়ি হাটে বিক্রির জন্য হয়ত লরি করে বাঁশ এনে ফেলা হচ্ছে। সেই বাঁশ ফেলার আওয়াজ নিয়ে কথা। 'অন্ধকার সেই মাঠের ভেতর থেকে আওয়াজ উঠে আসে চাপা প্রতিধ্বনির মত, কিন্তু ধারাবাহিক। সেই বাঁশের পাঁজার ওপর সারি সারি বাঁশ ফেলার আওয়াজ। সেই চাপা আওয়াজ একবার

শোনা গেলে কানে আসতেই থাকে। থামে না। হতে পারে ট্রাকের পর ট্রাক লোড হচ্ছে—টিটাগড়ের কাগজ কারখানার জন্যে। হয়ত ফরেস্টের সাপ্লাই। কিন্তু বেশির ভাগই কন্ট্রাক্টরের, নইলে গ্রামের বন্দরের হাটে কখনো বাঁশ হাটি বসত না। আবার হতেও পারে এটা বাঁশের আওয়াজই নয়। এমন ধারাবাহিক আওয়াজ ত অন্ধকারের ভেতর থেকে নানা কারণেই উঠতে পারে। দিনেও হয়ত ওঠে। কিন্তু অন্ধকারেই হয়ত বেশি শোনা যায়। তিস্তা কোন দিকে? কতদূর? তিস্তার বন্যায় ফরেস্টের শাল সেগুন ভেঙ্গে পড়েছে। এখন অন্ধকারে রাতারাতি তা টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসছে। হতে পারে সেই কুড়োল কাটার শব্দ। বা, এখন সন্ধ্যায়, সেই দূরের ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে ট্রাক বাস যাওয়ার আওয়াজ মাটি কাঁপিয়ে আসে। বা পাহাড়ের ওপরের কোনো বন্যা ন্যাওড়া নদী দিয়ে এখুনি বয়ে যাচ্ছে—দুই পাড়ে ধাক্কা দিয়ে আরো বেগে ও আরো বেগে। কোথাও হুড়মুড় করে পাথর পড়ছে? নাকি চা বাগানের জেনারেটরের আওয়াজ ফরেস্টে, নদীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুর পাক খাচ্ছে?"৮ কথার বিস্তারের আর একটি উদাহরণ—আদিপর্বের 'শেষ হাটি থেকে হাট শেষ' অধ্যায়ে হাটে ঘুরে বেড়ানো এক অশ্বারোহী প্রসঙ্গে—

"সেই ঘোড়া আর তার অশ্বারোহী এখন এই শূন্য হাটের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়, যেন এখনো সেখানে হাট, যেন এখনো তাদের মানুষজন ঠেলে ঠেলেই এগতে হচ্ছে। কিন্তু এখন আর অশ্বারোহী তার ভিক্ষার ঝুলি কাঠির ডগায় ঝুলিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে না। এখন আর ঘোড়াটিকে পেছনে ধাক্কা খাওয়ায় চমকে উঠতে হয় না। আর অস্পষ্ট চাঁদনিতে সেই ঘোড়া আর অশ্বারোহী ঘুমুতে ঘুমুতে প্রায় নির্জন হাটের অলিগলি দিয়ে পাক খেতে খেতে যেন মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বস্তির দিকেই চলেছে। হতে পারে এই অশ্বারোহী অন্ধ, হতে পারে এই ঘোড়াটি অন্ধ। হতে পারে এই ঘোড়া আর অশ্বারোহী দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো এক সময় পথ পেয়ে যাবে—তারপর আকাশের পটভূমিতে, নদীর চর ও অরণ্যের দূরত্বকে এই ঘোড়া আর তার আরোহী আদিগন্ত প্রান্তরের আলে আলে কমিয়ে আনবে। ভাদ্রের আকাশের ধূসরতার, নীল আর প্রান্তরের সবুজে, অরণ্যের কৃষ্ণাভ হরিতে এই ঘোড়া ও তার আরোহী কখনো মিশে যাবে, কখনো ঘোড়াটির লম্বিত গলাটিই ঝুলে থাকবে, ঘাড়ের ভেতর গুঁজে যাওয়া মাথা নিয়ে আরোহীর ছায়াটুকু ভেসে থাকবে, কখনো ঘোড়ার পেছনটা একটা ভাঙ্গা মেশিনের মত লাফাতে লাফাতে যাবে—যেন কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কখনো নদীর দুই পাড়ে ছায়া, মাঝখানের জল টুকুতে ওদের ছায়া, কখনো জলহীন নদীখাতটুকু যেন ঘোড়ার চারটি পায়ের ভঙ্গুরতা থেকে উজিয়ে গেছে, কখনো নদীর বাঁধের ওপর ছায়ায় আলোয়, নদীর ভেতর চরে বালিয়াড়ি

ভেঙ্গে, বা অরণ্যের কোনো গাছ তলায়। এখন মধ্য রাত্রিতে এই শূন্য হাটে বোঝা যায় না, এই ঘোড়া ও তার আরোহীর কোথাও একটা অবতরণ আছে।" ৯

ডিটেলস :

দেবেশ রায়ের উপন্যাস রচনার একটি উল্লেখযোগ্য রীতি বা বৈশিষ্ট্য হলো ডিটেলস বা অনুপুঙ্খ বর্ণনা। বিষয় সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা না থাকলে ডিটেলস-এ যাওয়া সম্ভব হয় না। এতে বিষয় আরও বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে যে নদী, মানুষ, প্রকৃতি এসেছে সে সম্পর্কে লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এত বেশি যে এ উপন্যাসে ডিটেলস-এর ছড়াছড়ি। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক— আদিপর্বে 'কৃষক মজদুর শ্রেণি সংগ্রাম' অধ্যায়ে সুহাসবাবুদের জরিপের কাজে ব্যবহৃত চেইন রাধাবল্লভ, হৃষিকেশদের খাস জমিতে পড়ায় তারা সেটাকে খারাপ অভিপ্রায় বলে মনে করে। তারা মনে করে চা বাগানের কোম্পানি 'স্যালায় এই বীরেনবাবুর ঘর, এই কোম্পানির ঘর, আমাদের পাছত দিয়া, লুকাইয়া আমিনবাবুক দিয়ে, এইঠে আমাদের জমিতে চেইন ফেলিছে।'

"দম নেবার জন্য রাধাবল্লভকে থামতে হয়। তখন তার গলার সবগুলো রগ ফুলে উঠেছে। যে কণ্ঠস্বরে ও যে ঘৃনায় সে এই কথাগুলো বলতে চায় তার সবটুকু যেন সে উগরে দিতে পারছে না। তাই তার মুখটা একটু ডাইনে বেঁকে গেছে যদিও তার শ্রোতার বেশির ভাগই বাঁয়ে। আর তার নীচের ঠোঁটটা চেবড়ে যাচ্ছে। তাতে তার ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের কালচে গোড়ায় জমে ওঠা থু থু, দেখা যায়।" ১০

বনপর্ব'এ ছাপ্পান্ন অধ্যায়ে চা শ্রমিক মেয়েদের সেজে গুজে যাওয়ার অনুপুঙ্খ বর্ণনা লক্ষ করা যায়।

"মেয়েদের শাড়ির চড়া রঙ। শাড়িগুলো একটু উঁচু করে পড়া। আঁচল নেই। সামনের দিকটা একটু বেশি তুলে আঁচলটা বুক থেকে নেমে এসেছে। চুলের বাহার পরনের বাহারকে হার মানায়। কারো চুল মাঝখানে সিঁথির দুপাশে পাট করা। কারো বা দুই বেণী মাথার ওপর তুলে গিঁঠ দেয়া। কারো আবার ছোট চুল, ঘাড়ের কাছে গিঁঠ। কারো একটু উঁচুতে খোপা বাঁধা। প্রায় সবার চুলেই ফুল। সকালে যে যা হাতের কাছে পেয়েছে, সেই ফুল গুঁজে দিয়েছে। দু একজনের মাথায় বড় বড় গাঁদা। কাল রাত্রিতে বাংলো থেকে তুলে এনে রেখেছে। বেগনি রঙের ছোট-ছোট ঘাস ফুলও কেউ-কেউ ঝাঁটার কাঠিতে গেঁথে গুঁজে দিয়েছে। ফুলের কাঠি মাথার ওপর উঠে আছে, চলার সময় কাঁপছে।'' ১১

বনপর্বের 'পঁয়ষট্টি' অধ্যায়ে একটি কুকুরের সঙ্গে বাঘারুর দীর্ঘক্ষণ খেলা চলে। খেলার অনুপুঙ্খ বর্ণনার

কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল। "কুকুরটা তার বুকে ভর দিয়ে দাঁড়ানোয় বাঘারুর পা হড়কে যেতে শুরু করে। সে কোমরটা আর বাঁ পা টা একটু এগিয়ে দিয়ে শরীরের ভর ঠিক রাখে। উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা থেকে এতক্ষণ ছাড়া পেয়ে কুকুরটা তার বশ্যতার সম্পূর্ণ শারীরিক তৃপ্তি ছাড়া শান্ত হবে না।

বাঘারু তাড়াতাড়ি কুকুরটার সামনের দুই পায়ের নীচে দুই হাত দিয়ে একটু সামাল দিতে চায়। তারপর বাঁ হাতটা কুকুরটার ঘাড়ের লোমের ভেতর সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের চামড়ার কাছে নখগুলো বেঁধায়। 'হয় হয় সিও, সিও'—এই শান্ত করার ধ্বনিতেও বাঘারুর শ্বাসের উষ্ণতা লাগে।

বাঁ হাতটা কুকুরের ঘাড়ে ঢোকানোয় বাঘারুর বাঁ বাহু ও ঘাড় ও মুখের নাগালের ভেতর চলে আসে। কুকুরটা বাঘারুর বাহুটা হাঁ করে কামড়ে ধরে। বাঘারু তার বাহুতে দাঁতের ধার টের পায়। ডান হাতটা দিয়ে একটু সরাতে হয় বাঘারুকে। পা হড়কে চিৎপাত পড়ে যেতে হয় মাটিতে। কুকুরটা পাশে পড়ে যায় কিন্তু চার পায়ের ওপর ঠিক দাঁড়িয়ে পড়ে। আর এই বার যেন ভাল বাগে পেয়েছে এমন ভাবে বাঘারুর ঘাড়ের খাঁজটার দিকে হাঁ করে মুখ এগিয়ে দেয়। 'খাড়ো', 'খাড়ো' বলে বাঘারু ওকে ঠেকাতে চায়। কিন্তু তবুও জোর খাটায় দেখে, হেসে ফেলে, বাঘারু দু হাতে ওর ঘাড় ধরে, 'শা-লো' বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

কুকুরটা বাঘারুর পায়ের দিকে গড়িয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে, বাঘারু উঠে পড়ার জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত আকাশের দিকে ধনুকের মত তুলে দিয়েছে। সেই ভঙ্গিকে আহ্বান ভেবে তার দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কুকুরটা বাঘারুর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। কিন্তু ও নিচু থেকে ঝাপ দেয় বলেই ধপ করে বাঘারুর বুকের ওপর পড়ে যায় আর বাঘারু আবার চিত হয়ে পড়ে। এবার কুকুরটা তার ওপরে।" ১২

চরপর্বে 'বন্যার মুখে শয্যা' অধ্যায়ে বন্যার আশঙ্কায় বাঁধে উঠে আসা আব্দুল নামে একটি আধ পাগলা লোক তার পোটলা-পুটলি থেকে একখানা কম্বল যেভাবে বাঁধের মাটিতে পাততে থাকে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা উদ্ধৃত করা হলো—

"আব্দুলের বিছানাটা আসলে একটা তুলোর কম্বল—এরকমই কোনো বন্যার সময় রিলিফে পেয়েছিল। সেটার তুলো অনেক জায়গায় উঠে গেছে, কোনো কোনো জায়গা ফেসেও গেছে, কিন্তু এমন নিপুণ ভাঁজ আব্দুলের যে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। সেই কম্বল খুলে তার ভেতর থেকে আব্দুল একটা পাটের দড়ি বের করে। বের করে দড়িটাকে পাশে রেখে, আবার কম্বলটাকে ভাঁজ করে। কম্বলটা খোলা হয় যতটা, ভাঁজ তার চাইতে বেশি। সেই ভাঁজের ওপর দাগ পড়ে গেছে—বেশ মোটা দাগ। ঐ দাগগুলো ছাড়া অন্য ভাবে

আর এ কম্বল ভাঁজ করাই যাবে না। কিন্তু আব্দুল লম্বা লম্বি ভাঁজ করে আবার খোলে। পুরো কম্বলই-দো-ভাঁজি করে সে উঠে দাঁড়ায়, তার মাথা ধরে সামনে ঝুলিয়ে ঝাকায়, তারপর খুব ধীরে সেটাকে মাটিতে ছোঁয়ায় আর আস্তে করে শোয়াতে শোয়াতে, নিজে কোমর ভেঙ্গে নিচু হতে হতে এগিয়ে কম্বলটাকে একেবারে মাটির ওপর মেলে দেয়। তারপর আবার যেখান থেকে সে শুরু করেছিল, সেই জায়গাটিতে ফিরে আসে। যেন কম্বলের, লম্বা করে শোয়ানো কম্বলেরও মাথা আর পা আছে।'' ১৩

এই আব্দুলের গল্প এক কথাবৃত্ত থেকে আর এক কথাবৃত্তে আসার উদাহরণও হতে পারে। চরপর্বের ছিয়াশি থেকে একশ' এক অধ্যায় পর্যন্ত 'ব্রিজে আলো কেন', 'জগদীশের রাগ', একটা নদীর ভেতর অনেক নদী', 'ভূগোলের ভেতরে ইতিহাস', 'চরের ভেতরে চরুয়া', 'ফ্লাড আসবে কতক্ষণ চার ঘন্টা না ছয় ঘন্টা', 'আটষট্টির বন্যার স্মৃতি', 'হিন্দি সিনেমার জোকার', 'বালিয়াড়ির মাথায় কে'? 'বানা, জাগরণ ও ঘুম'; 'দক্ষিণে পশ্চিমে জাগো আইস', 'নদী এখনো পুরানো', 'অকাল গোষ্ঠ', 'গরুর পালের পাড়ে ও জলে নামা', 'গরুর পালের পাড়ে ও বাঁধে ওঠা', 'চর দুই নম্বর'—অধ্যায়গুলিতে বন্যা অভিজ্ঞ চরুয়াদের আসন্ন বন্যার হাত থেকে বাড়ি ঘর, জমি-জিরেত, গরু-বাছুর রক্ষা করার কর্ম তৎপরতা, বর্ণিত হয়েছে। বাড়ির লোকজন, গরু বাছুর সব বাঁধে প্রতীক্ষা করছে তিস্তার ভয়াবহ বন্যার জন্য। এরই মাঝে ঐ বন্যার্তদের ভিড়ে আব্দুল নামক এক ভবঘুরে মানুষের আগমন। 'একশ দুই' ও 'একশ তিন' বন্যার মুখে জিপগাড়ি অধ্যায় দুটিতে আব্দুলের গল্প বলা হয়েছে। এক বৃত্ত থেকে অন্য এক কথাবৃত্তে এসে পড়া। এরপর 'বন্যার মুখে জীপ গাড়ি'র শেষাংশে আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফেরা হয়েছে।

আদি-মধ্য-অন্ত্য-হীনতা :

উপন্যাস শুরুর কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত উপন্যাসের প্লট নির্মাণ, ভাবনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইংরেজি মডেলের আদি মধ্য-অন্ত্য পদ্ধতিটিই অনুসরণ করে আসা হয়েছে। তাই উপন্যাসে তৈরি হয়েছে নিটোল গল্প। গল্প মানেই তার শুরু মধ্য ও শেষ বা উপসংহার থাকবেই। এতে উপন্যাসকে দুপারের বাঁধন মেনে চলতে হয়। ঐ বাঁধনের মধ্যেই কাহিনির যা ভাঙ্গা-গড়া। কিন্তু দেবেশ রায় তিস্তাপারের বৃত্তান্তে আদি-মধ্য-অন্ত্য'এর ধরা-বাঁধা ছকটি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। উপন্যাস বৃত্তান্তের সুবিধা নিয়ে মুক্তি পেয়েছে ছকের বাইরে গিয়ে। প্রথমে নামকরণের দিক থেকেই আলোচনা করা যায়। 'বৃত্তান্ত' কোন স্থির বিন্দুতে শুরুও হয় না শেষও হয় না। অন্তহীন এর চলা। সমাজের গতিময়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্তহীন চলার কাহিনিই তো তিস্তাপারের বৃত্তান্তে

লিখিত। তবু কোথাও শেষ তো করতেই হয়। লেখকও করেছেন। কিন্তু পা রেখেছেন সামনে যেখানে তার বৃত্তান্তের চরিত্র বাঘারু ও মাদারি— হেঁটেই চলেছে।

পর্ব ও অধ্যায় বিন্যাসের কৌশল এমনি খোলামেলা বাঁধনমুক্ত যে কোন অংশ যে কোন অংশের সঙ্গে অদল বদল করে নিলেও উপন্যাসের মূল সুরের বিঘ্ন ঘটবে না। এ যেন তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত হাটের মতোই। হাটে প্রবেশের যেমন নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। যখন খুশি যে কোন দিকে যে কেউ প্রবেশ করে, বেরিয়েও যায়। হাটে যেমন বহুস্বর, বহু মানুষের আলাপ আলোচনা, কর্মকান্ড অথচ দূরে একটু কান পাতলে এর একটা সামগ্রিক আওয়াজ কানে আসে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তেও তাই।

যুক্তির ধারাবাহিকতা এতে নেই। যুক্তি মানেই তো সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগোনো। জীবন তো সেই নিয়মে চলে না। জীবনের গতি, সমাজের গতি সরল রৈখিক নয়। তাই যুক্তির শৃঙ্খলায় বেঁধে এর রূপ নির্মাণ করাও অসম্ভব। তাই দেবেশ রায় যুক্তি পারম্পর্য ভেঙ্গে 'নির্গুণ চলনের' দ্বারা বাঘারুর গতি পথ তৈরি করেছেন। তাই এই বৃত্তান্তে কোন একক কাহিনি গড়ে ওঠেনি। এর প্রতিটি অধ্যায় বা এপিসোড্ যেন এক একটি গদ্যের বনানী। তার নিজস্ব বিস্তার আছে, গঠন আছে, গহিনতার আছে। লক্ষ লক্ষ শব্দ দিয়ে নির্মিত পাহাড়ের মত গঠিত বহুধা বিস্তৃত এবং ব্যাপ্ত এই উপন্যাসটিতে তিস্তা বনশ্রেণির মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে অগ্রসর হয়েছে আপন খেয়ালে। বন পাহাড় ঘেরা মাটিতে রাজবংশী, মদেশিয়া, ভাটিয়া কে না স্পর্শ পেয়েছে সেই গতিশীলা তিস্তার। এরকম প্রাকৃতিক সজ্জার মতো তিস্তাপারের বৃত্তান্ত নিয়মভাঙা নিয়ম বিশেষ। তবে এ নিয়ম খোলামেলা, স্বাধীন চলমান জীবনের ছবি আঁকার জন্য এ নিয়মই উপযুক্ত।

তিস্তাপারের মানুষের ছবি, তাদের জীবন যাত্রা, ভাষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, জীবন যন্ত্রণার নানা দিক তাঁর সঙ্গে এর বর্ণনার ভাষাটিও বড় চমৎকার। এর মধ্যেও আছে কিঞ্চিৎ ছক ভাঙার দুরন্ত সাহস।

বাঘারুর মতো একটি প্রান্তিক চরিত্র যা বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই তাকে নির্মাণ এবং নির্মাণের কৌশল ছক ভাঙার আর একটি দৃষ্টান্ত।

বহুস্বর :

দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্তের সংলাপ রচনায় বহুস্বর আর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি। বহুস্বর বা 'পলিফনি' সম্পর্কে তাঁর নিজের মতটি প্রথমে আলোচনা করে নেওয়া যাক। 'উপন্যাস নিয়ে' গ্রন্থে ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠায় উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে বাখতিনের মতামত আলোচনা করতে গিয়ে কীভাবে পলিফনি তৈরি হয়

সে কথার উল্লেখ করেছেন।

"সংলাপ 'প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স' ও 'পরোক্ষ ডিস্‌কোর্স' এই দুই ভাগের পর বাখতিন তৃতীয় আর এক ধরনের ডিসকোর্সের কথা বলেছেন যাতে। 'প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স-এ অর্থের ওপর বক্তার সম্পূর্ণ অধিকার। 'পরোক্ষ ডিসকোর্স'-এ আর এক ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বাচনে। আর তৃতীয় ধরনের ডিস্‌কোর্স-এ থাকছে দুটো কণ্ঠস্বর। কারণ, তার উদ্দিষ্ট হিশেবে থাকে আর একটি ডিস্‌কোর্স। এই দ্বিস্তর ডিসকোর্স-এর নমুনা আমরা দৈনন্দিনে পাই যখন অনুপস্থিত আর একজনের কথা একটু বেঁকিয়ে আমরা জানাই, এমনকী আর এক জনের গলার স্বরও নকল করি। ঔপন্যাসিক যখন আর একজনের বিবরণ দেন তার ভিতরও দুটো স্বরই সক্রিয় থাকে, লেখকের স্বরের মধ্যেই নিহিত থাকে যার কথা তার মত করে বলা হচ্ছে তারও স্বর। এটা দ্বিস্বর ডিসকোর্স বটে। তবে নিষ্ক্রিয়। প্যারডি আর লেখকের বিবরণ—এই দুই ধরনের দ্বি-স্বর ডিসকোর্সের পরেও বাখতিন আর এক ধরনের ডিসকোর্সের নাম দেন 'সক্রিয় দ্বিস্বর ডিস্‌কোর্স। সেখানে বাইরের কথা সাজানো হয় ভিতরে একটা অর্থ ঢুকিয়ে দিয়ে, সেখানে আত্মকথা বলা হয় বা স্বীকারোক্তি নেওয়া হয় আর একটা কণ্ঠস্বর লুকিয়ে রেখে, সেখানে অন্য কোন বক্তার প্রতি কটাক্ষে কোনো মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া হয়, সেখানে অন্য কোনো সংলাপের জবাবে কিছু বলে দেওয়া হয়, সেখানে সংলাপ গোপন করে কথা বলে যাওয়া হয়।.....তখন সেই চরিত্রের কথাগুলিতে আরো বহু বহু চরিত্রের বহু বহু বহু কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এছাড়া অনেক সময় চরিত্রগুলি আলাপ করে না—নিজেরা কথা বলে ফলে সংলাপগুলি দীর্ঘ হয়। 'সেই চরিত্রের জীবনের অনেকটাই যে ঐ সংলাপের ভিতর দিয়ে আমরা জানি—সঙ্গে আরো বহু চরিত্রকে।

এই ভাবেই 'ডায়ালজি' থেকে তৈরি হয় 'পলিফনি।"" ১৪

এ প্রসঙ্গে 'A Glossary of Contemporary Literary Theory' বইয়ে বলা হয়েছে 'Polyphonic literally, many voiced. The term is associated with the theories of Mikhail Baktin, especially with his idea of the polyphonic novel. In this study of Dustoevsky Baktin argues that Dostoevsky was the creator of the polyphonic novel. Baktin uses the word voice in a spcial ways (was), to include not just matters linguistic but also matters relating to IDEOLOGY and power in society, voice for dostoevsky refers not just to and originating person, but to a network of beliefs and power relation-

ship which attempt to place and situate the listener in certain ways" ১৫ নিচে বহুস্বরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

"দুই হাতের পাতায় চোখ ঢেকে, ফরেস্টার অন্ধকারকে আরো অন্ধকার করছিল। নীরবতা তৈরি হচ্ছিল। সে নীরবতায় এতক্ষণের কথাবার্তাগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই নীরবতার ভেতর থেকে ফরেস্টার শুরু করে 'শুন হে হুজুর, কাথা মোর একখান। না-হে, একখান না হয় দুইখান। কাথা মোর দুইখান। কী দুইখান কাথা? একখান কাথা হইল যে তোমরা ত জমির হাকিম। ত মোর নামখান তুমি কাটি দাও। মোর একখান ত জমি আছিল। আপল চাঁদ ফরেস্টের গা-লোগো। মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বলদ-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল কয়েক বছর। অ্যালায় আর নাই। মোর নামখান কাটি দাও। ঐ জমিখান লিখি দাও গয়ানাথ জোতদারের নামত্। বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার—জমি ত তারই হবা নাগে হুজুর। ত ঐ জমিখান মুই, ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন, ছাড়ি দিছু, লিখি দাও; শ্রী ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মনক এই জমিঠে উচ্ছেদ করা গে-এ-এ-ইল।'" ১৬

উপরোক্ত বক্তব্যটি বাঘারুর। কিন্তু এখানে লেখকের কণ্ঠস্বর ও শোনা যাচ্ছে। এমনকি প্রচ্ছন্ন পরোক্ষে 'হাকিম' এর কণ্ঠস্বরও লুকিয়ে আছে। গয়ানাথ জোতদারের নামে কেন বাঘারু 'জমিখান' লিখে দিতে চায়, সে একটা বিস্ময় মাখানো প্রশ্ন হাকিম করতেই পারতেন। না করলেও বাঘারুই উত্তর দিয়েছে 'বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার—জমি ত তারই হবা নাগে হুজুর।' হাকিমের অনুচ্চারিত সংলাপটিও পাঠক শুনতে পাচ্ছেন। এভাবে বহুস্বরের সৃষ্টি হয়েছে বাচনটিতে।

চরপর্বের 'তিরানব্বই' অধ্যায়ে ছোট ছোট সংলাপে দুই কথকের কথোপকথনে বহুস্বরের সন্ধান পাওয়া যায়।

'জগদীশ মাথা ঝাঁকায় সম্মতি জানিয়ে, এমন কি যেন গজেনের পরের কথাটাতেও সে আগাম সম্মতি জানাচ্ছে।

'সেই তোমার রাইত তিন ঘড়িত বসুক আর ধরো কেনে কালি সকালত আসুক?

গজেন আবার প্রশ্ন করে।

'হয় আসুক, সেই প্রায় শোনা যায় না গলায় আবার ধুয়ো ওঠে। জগদীশ মাথা নাড়ে।

'পাহাড় ঠে যে ফ্লাড নামিবার ধইচছে, স্যালায় ত আর হারি যাবার না পারে?

'না—পারে'

'এইঠে নামিবার নাগিবে, এই ঠেই, এই তোমার চরত আসি ধাক্কা মারিবেই।'

'মারিবেই'

স্যালায় হামাক এসকু (রেসকিউ) হবা নাগিবে?

'নাগিবে'

'ও এসকু হবার তানে কী নাগিবে? নৌকা নাগিবে।'

'নাগিবে'

'নৌকা ত নাই রো'

'নাই রো'

এক আছে রংধামালির হাটের ভাঙ্গা নৌকাখান— সেইটা কুনো কাজে লাগিবার না হয়।

'না হয়'

'হামরালা যেইলা এসকু হয়্যা যাম তার পাছত মিলিটারি নৌকা নামিবে।'

'নামিবে'

এ্যালায় এসকু আছে, নৌকা নাই।'

'নাই'

'স্যালায় নৌকা আছে, এসকু নাই।'

'নাই'

নিতাই দুহাতে তার পাশের লোকজনকে একটু সরিয়ে দিয়ে নিজে দুই পা পেছিয়ে যায়। তারপর গজেনের পেছনে এমন জোরে লাথি কষায় যে গজেন উল্টো দিকে রাবণের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যায়।" ১৭

এখানে 'সক্রিয় দ্বিস্তর ডিসকোর্সে' পলিফনি লক্ষ করা যায়।

এছাড়া আর এক ধরনের বহুস্বর আছে যখন বক্তা অন্যকারও সঙ্গে আলাপ করে না; নিজে নিজেই কথা বে যায়। সেখানে সংলাপ হয় দীর্ঘ। সেই সংলাপের ভেতরই বহুকণ্ঠস্বর লুকিয়ে থাকে। যেমন—''গাছ গিলা গয়ানাথের, পাখি গিলা গাছের, পাখিগিলা গয়ানাথের না হয়। গাছগিলার চামড়ার নাখান পাখি গিলা গাছের ডালত বাসা বান্ধি ধরোছে। যেইলা বাও দিবার ধরে, ঝড়ের নাখান বাও দিবার ধরে, বাওড় গাছ গিলার

ডালপালা ওটলপালট খাবার ধইচছে—এ্যানং ওলটপালট য্যান গাছের মাথা গিলা মাটিত নামি আসিবে আর গাছের শিকড়খান আকাশত উঠি যাবে—স্যালায় বৃক্ষের কুনোপ্রাণী বৃক্ষ ছাড়িবেন না। পাখপাখাল ডালপালা আঁটি ধরি থাকিবেন, পিঁপিড়া গাছের গাওত সিন্ধি যাবে, সাপখোপ গাছের গর্তত ঢুকি যাবে। সেই বৃক্ষখান যদি ঝড়ত উলট্ খায়, পড়ি যায়, স্যালায়ও বৃক্ষের কুনো প্রাণী বৃক্ষ ছাড়িবেন না। তারপর বাও থামিবেন, বৃষ্টি থামিবেন, বৃক্ষের পাতা পচি-খসি যাবার ধরিবেন—স্যালায় পাখপাখাল সাপ পিঁপিড়া নতুন গাছত বাসা বান্ধিবার ধরে। গয়ানাথের ঝড় গয়ানাথের গাছক-উপড়ি দিছে। গয়ানাথের বাঘারু মুই, গয়ানাথর গাছক ভাসি দিছি। গয়ানাথের বাঘারু মুই 'গয়ানাথর গাছ নিগি ভাসিছু। তিস্তার এই বানাত ভাসি যাছু। তিস্তার বানত ভাসি যাছু। তিস্তার বানার নাখান এই ঝড় আর বৃষ্টির বানাত ভাসি যাছু। গয়ানাথের বাঘারু মুই গয়ানাথর গাছনিগি ভাসি যাছু। গয়ানাথর জোয়াই আর গয়ানাথ ভটভটিয়া খান চড়ি সদর আস্তা (রাস্তা) দিয়া তামান চর আর কায়েম দেখি দেখি খুঁজিবার ধরিবেন—কোটে গিয়া ঠেকিল্ গয়ানাথর গাছ আর গয়ানাথর বাঘারু। মোর আর কী কষ্ট? বসি আছু, খাড়ি আছু, তিস্তার বানা মোক টানি নিয়া যাছে। গয়ানাথ দেউনিয়াখানের বড় কষ্ট। আসিন্দির জোয়াইখানের বড় কষ্ট। এ্যালায় এ্যানং বানা। কোটৎচর, কোটৎটাড়ি। আর এ্যানং ঝড়। এ্যানং বৃষ্টি। কোটত মোক খুঁজি খুঁজি বেড়িবার লাগিবে। মুই চিল্লি পারি—হে দেউনিয়া মুই এইঠে। কিন্তুক শুনিবেন সেই চিক্কার। কি আর করিবেন রে দেউনিয়া? তোমারলার গাছগিলা আর বাঘারুক জেলায় ভাসি দিছেন, স্যালায় ত তুলি নিবার নাগিবে। না-হয় ত সব খানই তোমার 'লস্', পুরাখান 'লস', এই চারিখান গাছ 'লস', এই বাঘারুখান 'লস'। জালিয়া যেই লা জালখান নদীতে ফেলেন, স্যালায় ত গুটিবার নাগিবেই। না হয় ত জালখানই 'লস'। তোমরালার গাছ গিলাক আর বাঘারু খানক-যেই লা ভাসি দিছু স্যালায় গুটিবার নাগিবেই। এই ঝড়ত্, এই বৃষ্টিত্ তোমার ভট ভটিয়াখান নিগি বাহির হওয়া নাগিবে। কিন্তু গাছের এই পাখি গিলা ত গয়ানাথ দেউনিয়ার না হয়। পাখিগিলা গাছের। গাছখান ফ্লাডত ভাসিবার ধরিছে ত পাখি গিলাও ভাসিবার ধরিছে। এ্যালায় ঝড়ত কাঁপিছে, বৃষ্টিত ভিজিছে, কিন্তুক পাখিগিলাই আন্ধার কাটি দিছে। পাখি গিলার কুনো গয়ানাথ নাই রো, কিন্তু পাখি গিলার ত বাঘারু আছো, মুই আছো। মোক দেখিবার নাগিবে না কেনে ভয় খাছে পাখিগিলা? ১৮

বাঘারুর এই দীর্ঘ স্বগত সংলাপে তার কণ্ঠে শোনা গেছে বহু মানুষের স্বর। গয়ানাথের ও গয়ানাথের জোয়াই আসিন্দিরের। সেই সঙ্গে লেখকেরও।

তিস্তাপুরাণের রচনা রীতি

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মত তিস্তাপুরাণেরও গঠন রীতি 'এপিসোডিক'। এখানেও সমগ্র উপন্যাসটি মোট সাতটি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি 'শেষ', 'আর এক শেষ', 'আরম্ভ' 'আরম্ভের পর', 'আর এক আরম্ভ', 'শেষান্তর' ও 'কথান্তর'। প্রতিটি পর্বে কয়েকটি করে অধ্যায় মিলে ১১০টি অধ্যায় আছে। অধ্যায় গুলির নামকরণ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত অপেক্ষা আকারে ছোটশব্দ বা বাক্যাংশ দিয়ে প্রস্তুত। যেমন— 'বুড়িমা', 'বাঁচা', সব কিছুর পেছনে', 'ধূপগুড়ি হাটে যাওয়ার প্রস্তুতি ইত্যাদি।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর পর দেবেশ রায় লিখেছেন তিস্তাপুরাণ। তাও আবার প্রায় ২০ বছর পর। 'বৃত্তান্ত'-এ যে রীতির শুরু 'পুরাণে' তার আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রয়োগ। পুরাণে তো সময়ের কোন পরম্পরা নেই। কোনটা আগে, কোনটা পরে সে হিসেব কে রাখে। তাই তিস্তাপুরাণ শুরু 'শেষ' দিয়ে। তারপর 'আর এক শেষ'। তারপরে 'আরম্ভ'। দুটি শেষের পর, তিনটি আরম্ভ, আরম্ভের পরও আর এক আরম্ভ। দুটি শেষেও যথেষ্ট নয়, আছে 'শেষান্তর'। তারপরেও কথা থাকে তাই 'কথান্তর', বলে আর এক পর্ব।

পর্বসজ্জাতেই দেখা গেল শেষের কথা আগে, আগের কথা মাঝে বা শেষে লিখে তিনি গতানুগতিক উপন্যাস কাঠামোর পরম্পরা ভেঙে দিয়েছেন। অথচ পুরাণ কথার মতই প্রতিটি পর্বের প্রতিটি অধ্যায় স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং পরস্পরের সঙ্গে কোন সূত্রে সঙ্গতিপূর্ণ। তিস্তাপুরাণেও দেখা যায়, একটি কথাবৃত্ত থেকে অন্য এক কথাবৃত্তে চলে যাওয়া, কথার বিস্তার, অনুপুঙ্খ বর্ণনা। এখানেও বহু স্বরিক সংলাপ। রাজবংশী কথার ব্যবহারে বক্তব্যকে দুটি তিনটি স্তরে কাজ করানো বা বহুস্বরের প্রয়োগ। কথকতার ভঙ্গিতে গল্প বলা, ফের আগের সূত্রে ফিরে আসা।

কথার বিস্তার :

'পরজন্ম' থেকে অধ্যায়ে নতুন সোলংগা তৈরি করার জন্য নতুন গাছ খোঁজার কথা চিন্তা করতে করতে ঘাটোয়াল এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে উঠে একটা আলো অনুসরণ করে দেখতে পায় এক পাতায় ছাওয়া ঘর। সেখানে গিয়ে সে দুই বুড়োবুড়ির গল্পে প্রবেশ করে। সেখানে ঘাটোয়াল একটি মাথোয়াল পায়। সেই মাথোয়ালের বর্ণনা করতে গিয়ে কথার বিস্তার লক্ষ করা যায়। কথা যেন ফুরোয় না — "মাথোয়ালটা নিয়ে এত-যে দেখে ঘাটোয়াল, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, উল্টে-পাল্টে, একবারও সে মাথায় দেয় না। মাথায় দেওয়ার জিনিশ

তো মাথাতেই দেওয়ার কথা, প্রথমেই। মিছিমিছি ত আর ঘাটোয়াল এত নদীর জল খায়নি। হাতে তোলার জিনিশ সবচেয়ে শেষে হাতে তুলবে — হাটে যদি কেউ হাত দাও কিনতে যায়, তবে কি সে বেচুয়ার কাছ থেকে দাওটা নিয়েই আগে ধার দেখবে, নাকী আগে হাতলটা দেখবে? আগে হাতল দেখবে, হাতে মুঠো করে দেখবে, মুঠো করে হাত মাথার ওপর তুলে দেখবে, মুঠো করে হাত মাথার ওপর থেকে নামিয়ে দেখবে। হাতল যদি হাতের মুঠোয় মুঠোয় লেগে যায়, তখন দাওয়ের কাঁধ দেখবে। ধারের দিকে তো ধার থাকবেই, তবে কোপটা জুত মত পড়বে কিনা তা নির্ভর করে দাওয়ের কাঁধ কতটা চওড়া, কতটা পেটানো, কতটা বেঁকা তার ওপর। সেটাও যদি লাগসই হয়, তাহলে দেখবে দাওয়ের মাথা। কত সরু, কত শক্ত, কত খাটো। এক কোপে যদি দাওয়ের মাথা ভেঙে যায়, তাহলে তো সারা জীবন ওই খুঁতো দাও নিয়ে কাটাতে হবে। এক জীবনে লোকে আর কটা দাও কিনবে?" ১৯

কথান্তর :

কোন কথা বা বিষয় বলতে গিয়ে তার ভেতর অন্য কথা ঢুকিয়ে দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা এই উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য যেমন—'কোন একদিন নিশ্চয় ছিল যখন বুড়িমাই সবার খেয়াল রাখত। আর সেকারণে বুড়িমাকেও সবার খেয়াল রাখতে হত। কবে যে এমন ছিল তা মাপার সব হিশেব এখন তামাদি হয়ে গেছে।'

এই মাপার হিসেব তামাদি হওয়া বিষয়টি বোঝাবার জন্য, " এবারের ধান গতবারের সমান হল, নাকী কম হল, নাকী বেশি হল, সে তো শুধু স্মৃতি দিয়ে মাপা হয় না, শরীরের স্মৃতি দিয়ে মাপা হয়। তাও একজনের নয়, যতদূর চোখ যায় ততদূর, যত মানুষ যতদিন ধরে খাটে, সেই সব ছড়ানো টাড়ি বাড়িতে যত বৌ-বেটি আছে তারা যতদিন ধরে পা নাচায়, হাত ছড়ায়, ধান সেদ্ধ জল গড়িয়ে দেয়—সেই সব প্রান্তর জোড়া আর ঘরভরা স্মৃতি দিয়ে একবছর তো দূরের কথা দশ বছরও মনে রাখা যায়, বা মাটির কথা.....যেন গুঁড়ি থেকেই শাল গাছ বাড়ে।" ২০

বুড়িমাকে খেয়াল রাখা ও বুড়িমার সবার খেয়াল রাখার বিষয়টা এতটা পুরনো হয়ে গেছে যে শুধু স্মৃতি দিয়ে নয়, শরীরের স্মৃতি দিয়ে মাপারও বাইরে, কোনো একা মানুষের নয় টাড়ি বাড়ির যত বৌ বেটি আছে তাদের শত সহস্র কাজের কথা যা দশ বছরও মনে রাখা যায়, তার থেকেও পুরনো। এই যে স্মৃতি মাপার জন্য-বুড়িমার গোতের বা টাড়ি বাড়ির মানুষ জনের কাজের বিস্তারের প্রসঙ্গ আনা, এটা দেবেশ রায়ের লেখার

একটা বিশেষ ধরন। কথান্তরে চলে গিয়ে বিষয়ের ব্যাপকতা বোঝানো। এ জন্য সাধারণত তিনি জটিল বাক্য ব্যবহার করেন। সে জন্য বাক্য বড় হয়। বস্তুনিষ্ঠঅনুপুঙ্খ বর্ণনা তিস্তাপুরাণে প্রায় প্রতিটি পৃষ্টাতেই দেখা যায়।

'লেভির আওয়াজ' অধ্যায়ে "লেভির আওয়াজটা যখন প্রথম এসে বুড়িমার গাঁওতে পৌঁছল তখন তাই মনে হল ভূটান পাহাড়টা আর উত্তর দিকে নাই। কোন ক্ষেতে কী রোয়া হবে কোন ক্ষেতে কতটা করে পচা সার খাওয়াতে হবে, শীতকালের শিশির আর হিম সাত সকালে পাতলা হাল দিয়ে কবে মাটিকে খাওয়াতে হবে, ভাদই চাষের জন্যে, কোন কোন ক্ষেত আগে তৈরি করতে হবে, গেল বছর বৃষ্টি না হওয়ায় এ বছর যদি আগে বৃষ্টি হয়। সে জন্য বিতরি ধানের জমিই বেশি করে তৈরি হচ্ছে, এত জমিতে ছিটানোর মত বিতরির বীজ এক বাড়িতে থাকে না, সে জন্য অন্যসব হাউলিয়ার বাড়িতে খোঁজ করতে হয়, কেউ ধার দিতে রাজী আছে কিনা, ফাল্গুন-চৈত্র, বৈশাখে বীজ ছিটিয়ে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়-শ্রাবণে ধানকাটা যায় এমন হিশেব করে জমি খুঁজতে হয়। বৃষ্টি যদি আগুরি হয় তাহলে আষাঢ়-শ্রাবণের ঢলে মাঠের পাকা ধান পচে যাবে। ঢালের জমি চাই, জল যাতে না দাঁড়ায়, চালের দাম যখন এত বেড়ে গেছে তখন বড়ি বাংলা, লুধিয়ান বা ধৌলির মত দামি পাতলা চাল কম করতে হবে। দামি চালের দাম আর কত বাড়বে, তার বদলে জমিরা, কালশনি, আর কাশিয়াপাঞ্জা বেশি করে লাগাতে হবে—টাউনের মানষি সে চাল পছন্দ করবে,.....তখন তো মনে হল ভুটান পাহাড় যদি পাহাড়েও থাকে, তাহলে মরাঘাট ফরেস্টে আগুন লেগেছে।" ২১

গল্প ঃ

পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর জাতকের গল্প বা বাংলার রূপকথা, মঙ্গলকাব্য, নাথকাহিনি ইত্যাদিতে এক গল্পের সূত্রে অন্য গল্প বলার রীতি লক্ষ করা যায়। রামায়ণ, মহাভারতাদি পুরাণ কাহিনি গুলিতেও এরকম অসংখ্য গল্পের সন্ধান মেলে। তিস্তাপুরাণেও বাংলার প্রাচীন গল্প বলার রীতি অনুসৃত হয়েছে। গোত্রনারী বুড়িমার গল্প বলতেগিয়ে লেখক বিভিন্ন পর্ব ও অধ্যায়ে আরও অনেক গল্পের অবতারণা করেছেন। সেই গল্প গুলির কাহিনির মজা তো আছেই—তাছাড়া সে গুলি দিয়ে উপন্যাসের লক্ষপূরণও হয়েছে। রাজবংশী সমাজেরও নানা দিক গল্পগুলির মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে।

তিস্তা নদীর মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে 'জননী কাউঠানি' অধ্যায়ে বলা হয়েছে' শিবঠাকুর মেচেনী পার্বতীর গল্প 'পরজন্ম থেকে' অধ্যায়ে সময়ের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে গল্প বলার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন "যে গল্পে

ইহজন্ম পরজন্ম সব একাকার হয়ে যায় সে সব গল্পে সময়ের কোন পরম্পরা থাকে না, যেন এক এর পরে দুই সব সব সময়ে আসে না।" ২২ আবার কয়েক পঙক্তি পরে বলেছেন অবিশ্যি এর উল্টোটাও হয়। কোন কোন গল্প এমন ব্যাঙের মত থাকতেও পারে, আছেও যেখানে একেবারে পিঠে পিঠে চার না এলে সবটাই একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এরকমই একটি গল্প এক থ্যামথ্যামা মানষির হটকোটিয়া বউ-র গল্প। গল্পের শেষে বলেছেন -'এমন গল্পে তো সবই টাইমের হিশেব দিয়ে।'

এ ধরনের গল্প এসেছে ঘাটোয়ালের নদীতে সোলংগা ফেঁসে যাওয়ার পর নতুন গাছ খুঁজতে গিয়ে 'বুড়ো বুড়ির গল্প' এরপর 'বাপব্যাটা আধিয়ার' অধ্যায়ে বাপব্যাটা আধিয়ারের গল্প এসেছে জমি আধিতে চাষ প্রসঙ্গে। 'ঘোড়া জোতদার' অধ্যায়ে আগের গল্পটির সূত্র ধরেই ঘোড়াহীন ঘোড়া জোতদারের একটি মজাদার গল্প বলা হয়েছে। 'শেষান্তর' পর্বের হস্তিকন্যা অধ্যায়ে তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়ার অণুসঙ্গে যে গান তৈরি হতে থাকে, সেই গানের সূত্রে এক গল্প তৈরি হয়—'হস্তি কন্যা'। ব্রাহ্মণ জয়নাথ আর ব্রাহ্মণী জয়মালা। জয়মালা কী করে হস্তিকন্যা হয়ে ওঠে—সেই মরমী কাহিনি।

ভাষা ঃ

ভাষা ব্যবহারে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ তিস্তাপুরাণকে অনন্যতা দিয়েছে। সুতরাং আঞ্চলিক ভাষা তিস্তাপুরাণের রচনা রীতিতে একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। তিনি 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে'তে প্রথম আঞ্চলিক উপভাষার আধুনিক প্রয়োগ করেছেন। এরপর 'মফস্বলি বৃত্তান্তে' রাজবংশী ভাষার সার্থক প্রয়োগ। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ও তিস্তাপুরাণে তা আরও অধিক সার্থকতা লাভ করেছে। তিস্তাপুরাণের রচনা রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজবংশী ভাষার ব্যবহার। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে রাজবংশী ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে লেখকের নিজের উক্তি "আমি রাজবংশী ভাষা রাজনীতির প্রয়োজনে শিখেছি। যখন শিখলাম তখন একবারও ইচ্ছে হয়নি ওই রাজবংশী ভাষায় আঞ্চলিক গল্প লিখব। আমার মনে হয়েছিল ওই রকম আঞ্চলিক লেখালেখির প্রয়োজন নেই। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলাম স্বাভাবিক গদ্যে একটা গল্প এগোচ্ছে হঠাৎ একটা রাজবংশী সংলাপ এসে গেল, সেখানে অ্যাখ্যান অন্য অর্থের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেখান থেকে আবার বর্ণনার ভাষায় চলে আসতে পারছি। আখ্যানটাকে দু'তিনটে স্তরে কাজ করানো যাচ্ছে।" ২৩ রাজবংশী ছাড়াও ব্যবহার করেছেন পূর্ববঙ্গীয় ভাটিয়া ভাষা, চা বাগানের শ্রমিক মজুরদের মদেশিয়া ভাষা। ভাষা সম্পর্কে

একটি পৃথক অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে এই অধ্যায়ে এ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করা হলো না।

দীর্ঘভূমিকা ঃ

যে শিরোনামে অধ্যায় চিহ্নিত হয়েছে, সেই অধ্যায়গুলির বস্তুনিষ্ঠ বিষয় আলোচনার আগে দীর্ঘ ভূমিকা এবং সেই ভূমিকায় নানা কথা বলে মূল বিষয়ে আসা তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য।

'খরার পাক' অধ্যায়টি আলোচনা করে বিষয়টি বোঝানো হল। প্রথম অনুচ্ছেদে "কেউ কি কোন দিন শুনেছে, কেউ বলেছে ওই পাহাড়টা পুরনো বা ওই নদীটা পুরনো। বা এই ফরেস্টখান পুরনো? যদি কেউ বলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় এই মানষিটা পাহাড় দেখেনি, নদী দেখেনি বা ফরেস্ট দেখেনি। ....। পাহাড়, ফরেস্ট, নদী এই সব পুরনো হয় না, এসব নতুনও হয় না। এসব যেখানে থাকে, সেখানে থাকে। একটা মানব জন্মে আর কটা নদী, কটা পাহাড়, কটা ফরেস্ট দেখতে পারে একটা মানুষ।" ২৪

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "মানুষ তো মানুষ। মানুষ আর কতদিন বাঁচে? এমন সাত আট জন মানুষ বাবা দাদা থেকে পুতির পুতি পর্যন্ত পরপর যতদিন হয়, ভূটান পাহাড়ের হাতি তো তত দিন বাঁচে — এক সঙ্গে সাত আট মানব জন্ম। .....আটদশ মানব জন্মের সমান এমন কটা হাতিও কি একটা পাহাড় বা ফরেস্ট দেখে বলতে পারে—এই ফরেস্টটা পুরনো? বা এই পাহাড়টা নতুন?" ২৫

তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'এমন কথা বলা হয় না। ভাষাটাই এমন নয় যে এই রকম একটা কথা তাতে বলা যাবে। এই কথার মধ্যে কেমন একটা অহঙ্কার মিশে থাকে না? যেন, আমি যখন দেখব তখনই পাহাড়টা থাকবে। .....বড় জোর আমি বলতে পারি আমার দেখাটা আজ নতুন হল, আমার ভেজাটা আজ নতুন হল। আর, তাও কি বলা যায়? অত বলাবলির থাকেই-বা কী?" ২৬

চতুর্থ অনুচ্ছেদে "এই বুড়িমা আছে, বুড়িমার গোত আছে, ক্ষেত বাড়ি আছে— এগুলো থাকে বলে আছে। বাইরের কোন আওয়াজ যদি এতদূর পর্যন্ত আসেই তাহলে তাকে এখানে আসার জন্যই আসতে হয়।" ২৭

পঞ্চম অনুচ্ছেদে "এই তল্লাটে যদি খাশজমি ক্ষেতজমি এসব নিয়ে কোন আওয়াজ তৈরি হয়, সে ধূপগুড়ির হাটেই হোক আর মাদারিহাটেই হোক, সে আওয়াজকে বুড়িমার গোতে আসতেই হবে। এ তল্লাট যত পুরনো

বুড়িমার গোতও তত পুরনো। পুরনোও নয়, বরাবরের।" ২৮

ষষ্ঠঅনুচ্ছেদে "বুড়িমার এই ক্ষেতবাড়িতে কত রকম জমি যে আছে, তার হিশেব এ বাড়ির যারা নিজেরা হাল ধরে ক্ষেতবাড়ির কোন এক টুকরোয় হাল দেওয়া থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত সব কাজ সেরে আবার নতুন এক টুকরোয় নতুন ক্ষেত বানাতে শুরু করে সেইসব জোয়ান মদ্দ, জোনাকুর ছোয়ার ছোয়া জংলু বকা দুখার বড় ছোয়া শানুর বড় ছোয়া আষাঢু বা ওই শানুরই মাইঝান বেটা ভাসার বড়বেটা ঢেপা বা ভিরার বড় বেটা মুতারু, বা বড়চিলার বেটা বড় মুতুরা এরা কিছুই জানে না। ..... তেমনি ক্ষেতবাড়িরও কোন হিশেব নেই, সারা বছর সেটা নানা ফসলে ভরাই থাকে।" ২৯

সপ্তম অনুচ্ছেদে "তেমন তেমন সময় হিশেবের কথা সবারই মাথায় আসে। যখনকার ঘটনা বলার জন্যে এতসব কথা উঠেছে, ৬৮ সালের বড় বানার সেই আগের পরের ভোটেরও কয়েক বছর আগে এখন যারা বুড়িমার গোতের মাতব্বর, সেই মাঘু সানঝু, ছোটবাবা, দুখারুর মধ্যে সানঝু তখন মায়ের বুক ছাড়েনি। আর মাঘু তখন একটা কঞ্চি নিয়ে গরুর দল যখন ফেরে তখন হৈ হৈ করে, তবু সেই দুই তিনখান খরার কথা বুড়িমার গোতের যে বাচ্চাদের শোনার ও মনে রাখার বয়স হয়েছে, তারা শোনে ও মনে রাখে। তাদের শুনতে হয় মনে রাখতে হয়। এই শোনা ও মনে রাখা বুড়িমার গোতের ইষ্ট।" ৩০

দেখা গেল ছটি অনুচ্ছেদের পরে সপ্তম অনুচ্ছেদে দুই তিনটি খরার কথা আমরা শুনতে পেলাম। তাহলে কী পূর্বোক্ত ছটি অনুচ্ছেদ অপ্রাসঙ্গিক? মোটেই নয়। দেশজ রীতির ধরনটাই এমন মূল কথায় যাওয়ার আগে অন্য কথা বলে তবে মূল কথায় আসা। আরও একটি জিনিস লক্ষণীয় যে এই অন্য কথা গুলি নানা তত্ত্বে, তথ্যে, গল্পে, বিবরণে ঠাসা।

ওপরের প্রথম অনুচ্ছেদে রাজবংশীদের জীবনযাত্রায় ফরেস্ট, পাহাড়ের ভূমিকা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মানুষের বাঁচার সঙ্গে ফরেস্টের, পাহাড়ের, নদীর বাঁচার তুলনা, তৃতীয় অনুচ্ছেদে ফরেষ্ট, পাহাড়ের প্রাচীনতা, চতুর্থ অনুচ্ছেদে সেই প্রাচীন পাহাড়কে নতুন রূপে দেখা, পঞ্চম অনুচ্ছেদে বুড়িমার গোতে কোন নতুন আওয়াজ আসার কথা এবং ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে বুড়িমার কত রকমের ক্ষেতবাড়ি, তাতে সারা বছরের কত রকমের ফসল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

এই ভাবেই অধ্যায়গুলিতে শুরুতে, মধ্যে বা শেষে ইচ্ছেমত মূল বিষয়কে লক্ষ করে নানা বিষয়ের অবতারণা

করা হয়েছে। মূল বিষয় বহির্ভূত এই বিষয় গুলি উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও তিস্তাপুরাণ' এর স্বরূপবিচার

উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে 'গতিশীল' ও 'জনপ্রিয়' এই শাখাটির সংজ্ঞা নির্দেশ করা বেশ শক্ত। কারণ এর মতো সর্বগ্রাসী স্বভাবযুক্ত সাহিত্যশাখা বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। তবু এর গড়ে ওঠার বিবিধ উপাদান লক্ষ করে উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

" আসলে উপন্যাসলেখক জীবনকে দেখেন, জীবনের গভীর ও বিচিত্র স্বাদ পেয়ে বিস্মিত ও উদ্বুদ্ধ হন এবং সেই বিস্ময়ের উদ্বোধনকে অনিবার্য ভাবেই স্বকীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে চান গল্প কাহিনীর মধ্য দিয়ে। এই পরিবেশনায় ঔপন্যাসিকের অবরুদ্ধ আবেগ মুক্তি পেলে তবেই তার তৃপ্তি। জীবনই হলো সমস্ত শিল্প সৃষ্টির মৌলিক উপকরণ এবং ঔপন্যাসিক ছাড়া আর কেউই বোধ হয় জীবনের মৌলিক উপকরণের সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ট নন। মানুষ, ঘটনা, দৃশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সংলাপ এই সমস্ত কিছুই ঔপন্যাসিককে ব্যস্ত রাখে, কৌতূহলী করে, তার পাঠককে বলে বা শুনিয়ে সেই উত্তেজনাকে শান্ত করে তবে তিনি স্বস্তি পান।' ৩১

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি মানুষের জীবন যখন লেখকের গভীর উপলব্ধিতে ধরা পড়ে, যখন তা গল্পের আকারে, ঘটনা, দৃশ্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সংলাপ ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে শিল্পরূপ ধারন করে তখনই সেই গল্প, কাহিনি বা আখ্যান বা বৃত্তান্ত হয়ে ওঠে উপন্যাস।

"একজন ইংরেজ সমালোচক বলেছেন : 'Novel is a narration in prose, based on a story in which the author may portrary character and the life on a age and analyse sentiments and passions and the reactions of men and women in their envirment' এই সংজ্ঞার তাৎপর্য দাঁড়ায় এরকম—উপন্যাসে থাকবে — ১, গদ্যাশ্রয়ী আখ্যান ২, বিশেষ যুগের চরিত্র ও ৩, কল্পিত নরনারীর অনুভূতি আবেগ প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ।' ৩২

জীবনের কথা বলা এই উপন্যাস মাধ্যমটির শ্রেণি বিচার করা কিন্তু সহজ কাজ নয়। কারণ বিভিন্ন লেখকের জীবনদৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন, লেখার ভঙ্গিমা বিচিত্র এবং লেখার বিষয়ও বিচিত্র। শ্রেণি নির্ণয়ের আর একটি অসুবিধার দিক হলো এক শ্রেণির লেখার ভেতর অন্য শ্রেণিলক্ষণ ঢুকে পড়া। এছাড়া শিল্পীব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার দরুণ শ্রেণির সাধারণ লক্ষণগুলি আলাদা হয়ে যায়।

বিষয়, গঠন ইত্যাদি নানা দিক বিচার করে বাংলা উপন্যাসকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

১) ক) ইতিহাস-রোমান্স ধর্মী উপন্যাস খ) পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস।

২) ক) চিত্রাত্মক উপন্যাস খ) কাহিনিমূলক উপন্যাস গ) চিত্র কাহিনি মিশ্রধর্মী উপন্যাস।

৩) ক) কাব্যধর্মী উপন্যাস খ) নাট্যধর্মী উপন্যাস গ) কাব্য-নাট্য-মিশ্র উপন্যাস ঘ) মহাকাব্যিক ঙ) খন্ডোপন্যাস।

৪) ক) ঘটনা প্রধান উপন্যাস খ) চরিত্র প্রধান উপন্যাস গ) চেতনা প্রবাহী উপন্যাস।

৫) ক) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস খ) ভ্রমণোপন্যাস গ) পত্রোপন্যাস ঘ) ডায়েরীধর্মী উপন্যাস।

৬) ক) নীতি-ধর্ম-তত্ত্ব প্রচারমূলক উপন্যাস খ) রাজনৈতিক উপন্যাস, গ) জীবনীমূলক উপন্যাস ঘ) অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাস ঙ) গোয়েন্দা উপন্যাস চ) প্রেমোপন্যাস, ছ) ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস জ) ফ্যানটাসি

৭) ক) কথক চরিত্র মূলক উপন্যাস খ) কথক-লেখক চরিত্র মূলক উপন্যাস ইত্যাদি।

রোমান্স ও সামাজিক উপন্যাস—বাংলা উপন্যাসের সবচেয়ে পরিচিত শাখা। বাংলা উপন্যাসের ধারায় প্রথম প্রায় চল্লিশ বছর এই দুটি ধারা একসঙ্গে চলেছে। তারপর অবশ্য রোমান্স ধারাটি অবলুপ্ত হয়েছে এবং সামাজিক উপন্যাস ধারাটি ক্রমবিস্তার লাভ করেছে।

শুদ্ধ রোমান্সের উদাহরণ হিসেবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালের মন্দিরা', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মাধবীলতা'র নাম উল্লেখ করা যায়। আর ইতিহাস মিশ্রিত রোমান্স যাকে অনেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়েও ফেলেন তেমন গ্রন্থগুলি হলো—বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ইত্যাদি।

পরিবারকে কেন্দ্র করে পরিবারের নানা সমস্যা এবং সেই সূত্রে সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস। তারাশঙ্করের গণদেবতা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সামাজিক উপন্যাসের বিভাগে পড়ে। আর শরৎ চন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' বা 'বৈকুণ্ঠে'র উইল' কে ফেলা যায় পারিবারিক উপন্যাসের বিভাগে।

চিত্রাত্মক উপন্যাসে শুধু চিত্রই প্রাধান্য পায়। যেমন 'আলালের ঘরের দুলাল'। কিন্তু শুধু চিত্রে ঠিক উপন্যাস হয় না, কাহিনির উপস্থাপন চাই। যেজন্য আলালের ঘরের দুলাল কিছু পরিমাণে উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত হয়েও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি।

কাহিনি মূলক উপন্যাসে কাহিনির আর্কষণই প্রধান। এক কাহিনির সঙ্গে আরও একাধিক কাহিনি যুক্ত হতেও পারে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এ জাতীয় উপন্যাস। এ উপন্যাসে অন্নদাদিদি, অভয়া, কমললতা চিত্র না থেকে কাহিনি হয়ে উঠেছে, একাধিক কাহিনির সংযুক্তি ঘটেছে।

আধুনিক উপন্যাসে চিত্র ও কাহিনির নানা আনুপাতিক মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। তাতে কাহিনিগুলি লেখকের প্রধান লক্ষ থাকে না। কাহিনির চলতে থাকা অবস্থায় আগে পিছে মধ্যে লেখক নানাস্থানে নানা সুযোগে সমাজের নানা ছবির অনুপ্রবেশ ঘটান।

যে উপন্যাস আগাগোড়া গদ্যে রচিত হলেও কাহিনি ও চরিত্র একটা সঙ্গীতের মূর্ছনা ও একটা কাব্যিক সুগন্ধ নিয়ে আসে তাকে বলে কাব্যধর্মী উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' তারাশঙ্করের 'কবি' এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে।

নাটকের আদর্শে রচিত উপন্যাসকে বলা হয় নাট্যধর্মী উপন্যাস। কাহিনি, উপকাহিনি থাকে। কিন্তু উপকাহিনি মূল কাহিনির সম্পূর্ণ অনুগত। ক্রিয়া-প্রাধান্য, নাটকীয় চমক, আকস্মিক বাঁক ফেরা এ জাতীয় উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসে এসব নাটকীয় লক্ষণ বর্তমান।

চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস—'চেতনা প্রবাহ' কথাটি মনস্তত্ত্ব জাত। কাহিনি নয়, চরিত্র নয়, এমনকি সেই অর্থে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নয়, মানব মনের চেতনার গভীরে অবস্থিত মনস্তর যে চিন্তনস্তর সেই প্রাক-বাচনিক স্তর থেকে উঠে আসা গতানুগতিক যুক্তি পারম্পর্য, বাক্যগত অন্বয়, শব্দের ব্যাকরণ সম্মত বা প্রথাগত বিন্যাসমুক্ত বাক্‌শিল্পকেই বলা হয় চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস। রবার্ট হামফি প্রদত্ত চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসের সংজ্ঞা বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 'We may define stream of consciousness as a type of fiction in which the basic emphasis is placed on explanation of the pre-speech levels of consciousness for the purpose, primarily, of revealing. The sychic being of the caracters'. প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ক) এ জাতীয় উপন্যাসের প্রকাশের বিষয় অন্তর্জগতের জটিল টানাপোড়েন।

খ) কোনো আকর্ষণীয় গল্প বা কাহিনি, সুসংবদ্ধ প্লট লিখে কী ঘটেছে দেখানোর চেয়ে কেন ঘটেছে দেখানোটাই এর মূল উদ্দেশ্য।

গ) 'অন্তরস্থ স্বগতোক্তি'র কৌশল অবলম্বন করে লেখক মানবমনের বিচিত্র ভাবনা, অসংখ্য অনুভবকে

টেনে বের করে আনেন। তাতে অনেক সময় প্রচলিত যুক্তি পরম্পরা, বাস্তবতার স্তর ভেদ রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

ঘ) চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসে সময় থাকে, কিন্তু 'সময়ানুক্রমিক' বিন্যাস থাকে না। বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ সব কেমন এলোমেলো হয়।

ঙ) সিনেমার রীতি অবলম্বন করে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া মানব ধারণাগুলিকে আগে পিছে, সমান্তরালে নিয়ে গিয়ে দৃশ্য করে তোলা হয়।

চ) এইসব ভাবনা বা অনুভব বর্ণনার ভাষাও ভিন্নতর। কখনো আপাত অসংলগ্ন, কখনো বা ছেদযতি বর্জন করে চেতনা প্রবাহের মতোই গতিশীল।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', রবীন্দ্রোত্তরকালের বুদ্ধদেব বসুর 'লালমেঘ', গোপাল হালদারের 'একদা', মতি নন্দীর 'নক্ষত্রের রাত'। এই পর্যায়ের আরো ভালো উদাহরণ সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'।

মনস্তত্ত্ব মূলক উপন্যাস—যে উপন্যাসে আখ্যান বা প্লটের চেয়ে চরিত্রের মন-মনন-মেজাজ মানসিকতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় তাকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস—'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহনা', এই শ্রেণির উপন্যাসের মধ্যে পড়ে।

রাজনৈতিক উপন্যাস—যে কোন উপন্যাসই, কোনো সময়ে, কোনো রাজনৈতিককালে মানুষের রাজনৈতিক আবহে নির্মিত। সেই দিক থেকে সব উপন্যাসের মধ্যেই রাজনীতি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবু শুদ্ধ রাজনৈতিক উপন্যাস তাকেই বোঝানো হয় যার মধ্যে একটি দেশ ও জাতির প্রাণময় আবেগ ও উত্তেজনা, সর্বজনীনতা লাভ করে। কোনো রাজনৈতিক মত আড়ালে থাকলেও তার আবেদন হয়ে ওঠে ব্যাপক ও মানবিক। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথেরদাবী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণিভুক্ত।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস—যে উপন্যাসে লেখক তাঁর অতীত স্মৃতি বা হারিয়ে যাওয়া দিনের অভিজ্ঞতা-রোমন্থন করেন এবং পাঠকের সঙ্গে গড়ে তোলেন নিবিড় একাত্মতা তখন তাকে বলা হয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এই শ্রেণির উপন্যাসে লেখক কখনো সরাসরি উত্তম পুরুষে তার বক্তব্য শোনাতে থাকেন, আবার কখনো কথক চরিত্রের মুখে উত্তম পুরুষে কথা বলানো হয়। যেভাবেই কথক কথা বলুক উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলি তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে আসলে লেখকেরই ব্যক্তিজীবনের নানা দিক উন্মোচন করতে থাকে।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক এই শ্রেণির উপন্যাস।

পত্রোপন্যাস—যে উপন্যাসে পত্রের আকারে উপন্যাসের ঘটনা, তথ্য প্রকাশিত হয়, উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলি পত্রের মাধ্যমেই তাদের আপনাপন বক্তব্য উপস্থাপিত করে; সর্বোপরি পত্রের মাধ্যমেই আখ্যানের বিস্তার ঘটে তাকেই বলা হয় পত্রোপন্যাস। বাংলায় তেমন সার্থক পত্রোপন্যাসের সন্ধান না পাওয়া গেলেও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'পোনুর চিঠি' শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চমিথুন', তরুণকুমার ভাদুড়ীর 'সন্ধ্যাদীপের শিখা' কে অংশত পত্রোপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

আর এক ধরনের উপন্যাসের সন্ধান মেলে যা অনেকটা ডায়েরির মতো। তবে দিনলিপি বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। এতে প্রতিদিনের কথা কালানুক্রমিকভাবে লিখিত হয় না। কোনো দিন মনে হল তো অনেক লেখা হলো আবার কিছু লেখা হলো বেশ কিছুদিন পর। কোনো সূত্র হারিয়ে গেল, কোনটা আবার ফিরে এসে খেই ধরল। এভাবে লেখা উপন্যাস কখনো ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক, কখনো বা ডায়েরিমূলক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিনকে এর কাছাকাছি বলা যেতে পারে। যদিও 'আরণ্যকে'র ভূমিকায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন—'ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরি নহে—উপন্যাস।'

অ্যাবসার্ড উপন্যাস—আলব্যের কাম্যুর 'দি মিথ অব সিসিফাস' প্রবন্ধে প্রথম অ্যাবসার্ড কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পন্ডিতেরা অ্যাবসার্ড বলতে বুঝিয়েছেন ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা, divorce between man and his life উদ্দেশ্য বিযুক্ততা ইত্যাদি অনেক কিছু। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা দিল। মানুষ হয়ে উঠল আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, জটিল, বিচ্ছিন্ন। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে অণু পরিবার তৈরি হল। অতি নৈকট্য দূরত্বের কল্পনা চূর্ণ করে দিয়ে নিয়ে এলো বিষাদ। এইসব ভাবনার ওপর ভিত্তি করে, এইসব মানসিক দ্বন্দ্ব, নিঃসঙ্গতা, ব্যাকুলতা নিয়ে রচিত হল অ্যাবসার্ড শ্রেণির উপন্যাস। যাকে কেউ বলেন উদ্ভট, কেউ বলেন অমূর্ত। বাংলায় তেমন কোনো অ্যাবসার্ড উপন্যাসের সন্ধান মেলেনি। সমরেশ বসুর 'বিবর' খানিকটা কাছাকাছি গেলেও, জীবনকে শূন্য ভাবতে না পারায় পুরোপুরি অ্যাবসার্ড হতে পারেনি।

নীতি-ধর্ম-তত্ত্ব প্রচার মূলক উপন্যাস একালে আর তেমন লেখা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী'কে ধর্মতত্ত্বমূলক উপন্যাস বলা চলে।

দুঃসাহসিক ঘটনা নিয়ে রচিত হয় অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস। বিশেষত এজাতীয় উপন্যাস কিশোরদের জন্যই

লিখিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সূর্য কাঁদলে সোনা' এই শ্রেণির উপন্যাস। সত্যজিৎ রায়ের কিছু গল্প এই জাতীয়। তবে এগুলিতে উপন্যাসের বিস্তার না থাকায় উপন্যাস নয়।

গোয়েন্দা কাহিনিমূলক উপন্যাস আজকাল খুবই জনপ্রিয়। জট পাকানো ব্যক্তিত্ব, অপরাধ, রহস্য উদঘাটন ইত্যাদি এর প্রতিপাদ্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের কাহিনিগুলি এবং সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজ এই শ্রেণির উপন্যাসের মধ্যে গণ্য।

আঞ্চলিক উপন্যাস— বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি শ্রেণি করণের প্রবনতা দেখা দিয়েছে। অঞ্চল বিশেষের ভূপ্রকৃতি, নিসর্গ, মাটি, মানুষকে নিয়ে সেই অঞ্চলের নিজস্ব ভাষায়, একটি জনগোষ্ঠীর জীবন চিত্র অঙ্কন করাই এর উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যেও এধরণের উপন্যাস রচিত হয়েছে। সেখানে এদের 'Novel of the local colour' বা 'Novel of the soil ইত্যাদি নাম নেওয়া হয়েছে। Regionel Novel কথাটিও প্রচলিত।'

সমালোচকের ভাষায় — " A regional writer is one who concentrates much attention on a particular area and use it and the people who inhabit it as the basis of or his or her stories. Such a local is likely to be a rural and or provincial" ৩৩

এই শ্রেণির উপন্যাসের মূল লক্ষণগুলি লক্ষ করে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এর একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন।

"কোন ঔপন্যাসিক যখন কোন বিশেষ দেশাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সমাজ প্রেক্ষিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে তাঁর রচনায় রূপ দেন যাতে ঐ অঞ্চল যেন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মিকযোগে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জনজীবনে তার সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্য দিয়েও সর্বজনীন রসবেদনে পৌঁছায়—তখনই তাঁর রচনাকে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বলা যেতে পারে।" ৩৪

সূত্রাকারে লক্ষণগুলি এরকম হবে—১) উপন্যাসটি একটি বিশেষ ভূখন্ড আশ্রয়ে রচিত হবে, ২) এই ভূখন্ড-ধৃত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা হবে, ৩) ভূখন্ডই একটি চরিত্র হয়ে উঠবে, ৪) এখানকার জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, রীতিনীতি, আশা আকাঙ্খা ব্যক্ত হবে, ৫) এরা বাংলাভাষী হয়েও, আঞ্চলিক প্রভাবে ভাষায় আঞ্চলিক রূপ থাকবে; ৬) আঞ্চলিকতার সব লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসে একটি সর্বজনীন আবেদন থাকবে; ৭) লেখক এই অঞ্চলটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

বাংলা উপন্যাসে শৈলজানন্দ এই আঞ্চলিক ধারার সূচনা করেন। কিন্তু সার্থকতা লাভ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'; সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' প্রভৃতি উপন্যাসে।

মহাকাব্যিক উপন্যাস — আপাত দৃষ্টিতে মহাকাব্য ও উপন্যাসের মধ্যে অমিলটাই বেশি চোখে পড়ে। মহাকাব্য সেকালের উপন্যাস একালের। মহাকাব্য পদ্যে রচিত, উপন্যাস গদ্যে। মহাকাব্যের নায়ক 'ধীরোদাত্ত, সদবংশজাত। আর উপন্যাসের নায়ক রাজা, জমিদার, কৃষক, শ্রমিক সমাজের অত্যন্ত নিচুতলার মানুষও। মহাকাব্যের বাস্তবতার সঙ্গে অলৌকিকত্ব, অতিপ্রাকৃত বিষয় সম্পৃক্ত। কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবতা জীবনেরই দৈনন্দিনের বাস্তবতা। তা সত্ত্বেও মহাকাব্যিক উপন্যাস বলতে উপন্যাসের এমন একটা শ্রেণিকে বোঝায় যেখানে মহাকাব্যের অন্তর-স্বভাবের সঙ্গে উপন্যাসের মিল প্রচুর। অর্থাৎ যে উপন্যাস মহাকাব্যের মতো একটা বিশাল বিস্তৃতি নিয়ে কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবনবোধ, জন্ম-মৃত্যু-জয় পরাজয়, দ্বন্দ্ব, হাসি-অশ্রু-র বিবরণ দেয় এবং মহাকাব্যের মূল অনুভব সাব্লাইম-এর কাছে নিয়ে যায় তাকে মহাকাব্যিক উপন্যাস বলে। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' উপরোক্ত উপন্যাস শ্রেণির কোন শাখাভুক্ত বা কোন কোন শ্রেণির লক্ষণযুক্ত তা আলোচনার আগে উপন্যাস দুখানির স্বরূপ বিচার আবশ্যক।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর স্বরূপ বিচার

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', আদি পর্ব, বনপর্ব, চরপর্ব, বৃক্ষপর্ব, মিছিল পর্ব, অন্ত্যপর্ব মোট ছ'টি পর্ব ও পরিশিষ্ট নিয়ে এক বৃহৎ উপন্যাস। এতে আছে গয়ানাথ-আসিন্দির, বাঘারু-কাদাখোয়া, সুহাস-প্রিয়নাথ, এম,এল,এ, ইঞ্জিনিয়ার, হৃষিকেশ-রাধাবল্লভ, পঞ্চানন মল্লিক-সম্পৎ রায়, মাদারি-মাদারির মা'র মতো অসংখ্য চরিত্র।

এই চরিত্রগুলি ছড়িয়ে আছে গাজোলডোবার তিস্তার পারে জমি জরিপের কাজে, কৃষক-মজুর শ্রেণি সংগ্রামে, বাঘারুর পিঠে চড়ে এম, এল, এ-র নদী পার হওয়ার ঘটনায়, ডায়নার চরে বাঘারুর নির্বাসনে, চরুয়া নিতাই-জগদীশদের বন্যায় ভেঙ্গে পড়া গয়ানাথের গাছ নিয়ে বাঘারুর বন্যা-উন্মত্ত-তিস্তায় ভেসে চলার ঘটনায়, স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে উত্তরখন্ড আন্দোলনে এবং মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে। এবং আরও বহু ঘটনা, কাহিনি ও গল্পে।

তিস্তাপারের এই চলমান বিশাল বৃত্তান্ত তো কোথাও থামাতেই হয়েছে। সেটা থেমেছে গিয়ে অন্ত্যপর্বে তিস্তার বুকে ব্যারেজ নির্মাণ ও তার উদ্বোধনের ঘটনায়।

উপন্যাসখানির অন্তর্গত ঘটনা বা আখ্যানগুলি ছাড়াও এর বহিরাবয়ব তথা অঙ্গসজ্জার দিকে নজর দিলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা উপন্যাসখানির স্বরূপ নির্ণয়ের সহায়ক। উপন্যাসের প্রচ্ছদে অঙ্কিত তিস্তাপারের বনভূমি। দীর্ঘ চির হরিৎ বৃক্ষের বন। বিশেষ অর্থবহ এই বনভূমির চিত্র। সন্দর্ভকারের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় লেখক বলেছেন যে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নামটি দেওয়ার আগে তিনি উপন্যাসটির নামকরণ করেছিলেন 'বনান্তরালে'। ছাপানোর জন্য কম্পোজও হয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে তা পাল্টিয়ে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' রাখা হয়েছে। প্রচ্ছদ সেই 'বনান্তরালে'র চিহ্নবহন করছে বলে মনে হয়। 'উপন্যাসটির উননব্বই অধ্যায়ে একটি পংক্তিতে 'বনান্তরাল' শব্দটির ব্যবহার আছে। ".....সে নদীকে নদীর জায়গা ছেড়ে দিয়ে রাজবংশীরা বনান্তরাল থেকে নদীকে ব্যবহার করত।" ৩৫

প্রচ্ছদের পরের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নামাঙ্কিত পৃষ্ঠায় একটি পেশি বহুল দীর্ঘাকৃতির চলমান পুরুষের ছবি। ছবিটি অবশ্যই বাঘারুর। বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে তিস্তাপারেরই চারজন—নন্দনপুর বোয়ালমারির নিতাই সরকার, ঘুঘুডাঙ্গার আকালুদ্দিন, বানারহাটের যমুনা ওরাওঁনি, গয়েরকাটার রাবণ চন্দ্র রায়কে। এরা তিস্তাপারের রাজবংশী ভাটিয়া, মদেশিয়া, জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। লেখক বলেছেন—'এই বৃত্তান্ত তারা কোনদিনই পড়বে না, কিন্তু তিস্তাপারের জীবনের পর জীবন বাঁচবে।' সূচিপত্রের পরের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত আছে তিস্তাপারের একটি ম্যাপ। মোটা কালো দাগে তিস্তা, নাগরাকাটা, ডায়না, জলঢাকা নদী আকাঁ। একেবারে পূর্ব সীমান্তে তোর্সা নদী। মোটা সাদা দাগে ন্যাশন্যাল হাইওয়ে, ল্যাটারাল রোড। বনাঞ্চলের ছবি এঁকে আপলচাঁদ ফরেস্ট, মালবাজার, চালসা, মাদারিহাট ইত্যাদি বনভূমি দেখানো হয়েছে। আর জলপাইগুড়ি, গাজোলডোবা, ক্রান্তির হাট, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, দোমহনি, জল্পেশ, ধরমপুর ইত্যাদি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। উপন্যাসের ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠার মাঝখানে আর একটি ম্যাপ দেওয়া হয়েছে। এই ম্যাপে আপলচাঁদ ফরেস্টকেই বেশি করে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিস্তাপারের জমি জরিপ চলাকালীন মৌজা ম্যাপ হিসেবেই এই ম্যাপখানি অঙ্কিত। বাংলা উপন্যাসে এরকম ম্যাপের ব্যবহার এই প্রথম।

শিলিগুড়ি থানা
তোর্সা নদী

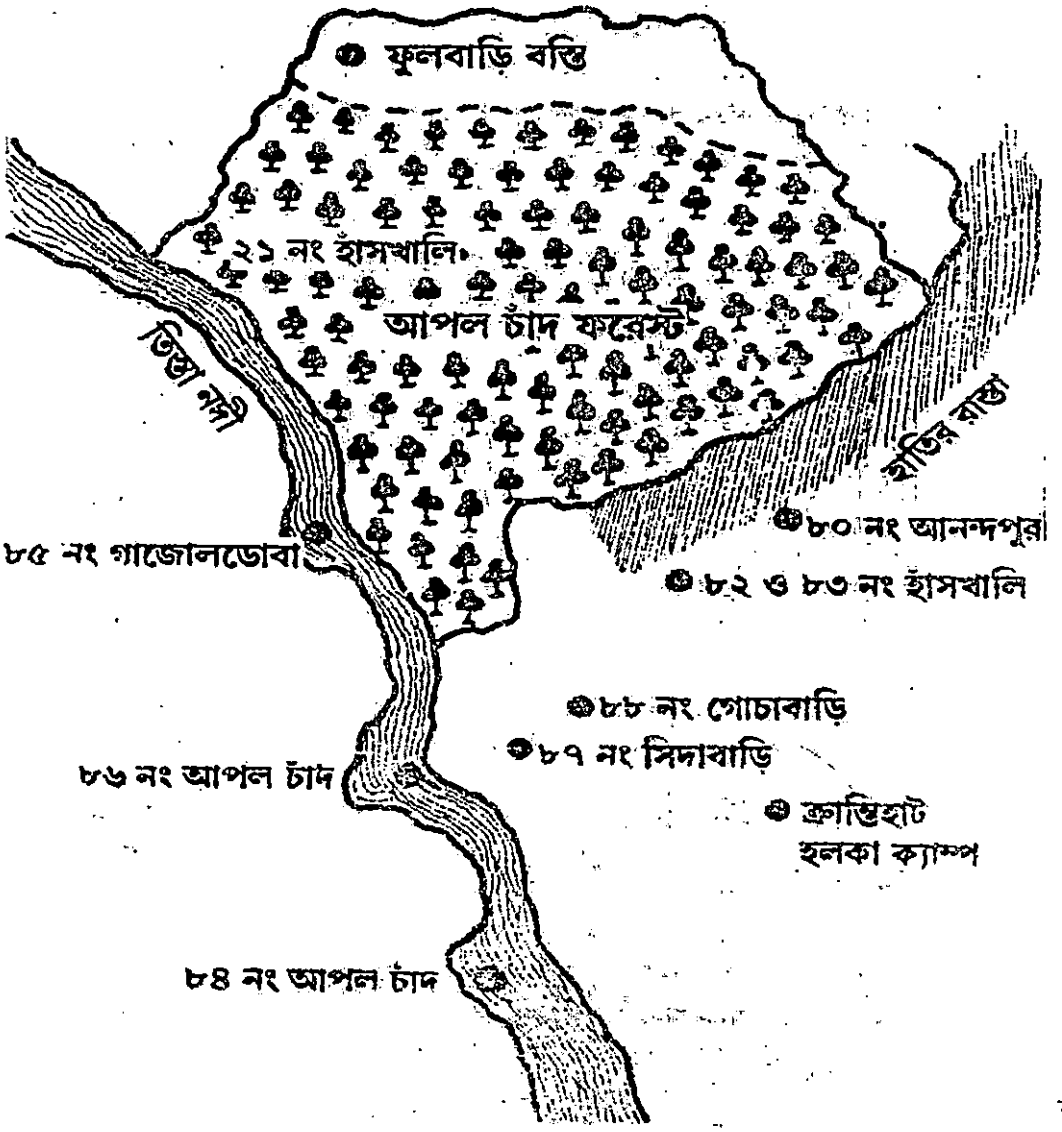

র

আঞ্চলিকতার নানা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। ঘটনার কেন্দ্র তিস্তাপারের গাজোলডোবা। এই গাজোলডোবায় তিস্তাপারের জমি জরিপের কাজ দিয়েই বৃত্তান্তের শুরু। আবার এই গাজোলডোবাতেই তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ ও উদ্বোধন দিয়েই বৃত্তান্তের সমাপ্তি। গাজোলডোবা থেকে গাজোলডোবা। যেন একটা বৃত্ত। একটি ভূখন্ড। পশ্চিমে আপলচাঁদ থেকে পুবে ডায়না, এই তো তিস্তাপার। এই ভূখন্ডের অন্তর্গত গাজোলডোবার উত্তরে পশ্চিমে শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এর সীমান্ত সন্নিহিত পাহাড় বনাঞ্চল। পুবে দক্ষিণে চালসা, মালবাজার, লাটাগুড়ি, ওদলাবাড়ি, মাদারির হাট, লাটাগুড়ি, মাদারির হাট, ফালাকাটা একেবারে তোর্সার পারে পুন্ডিবাড়ি, মাদারির মায়ের সাকোয়াঝার ইত্যাদি নানা ঝোরা, সোঁতা, নদী, চা বাগান, বনজঙ্গ ল ঘেরা ডুয়ার্স।

এই এলাকায় বসবাস করে প্রধানত রাজবংশীরা। এছাড়া আছে চা-বাগানের শ্রমিক মদেশিয়া, ওরাওঁ, প্রভৃতি আদিবাসি মানুষ, আছে পূর্ববঙ্গাগত নম:শূদ্র ভাটিয়া। কিছু চা-বাগানের বাঙালীবাবু, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি। গয়ানাথ, নাউছার আলম, আসিন্দির, বাঘারু, সুহাস, প্রিয়নাথ, এম,এল,এ হৃষিকেশ, রাধাবল্লভ, নিতাই রাবণ, জগদীশ, কাদাখোয়া, নরেশ, অমূল্য, আলবিশ, বীরেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষীগণ, অশ্বিনীরায়, ডি.এম. অন্যান্য অফিসারগণ, টিভি ও রেডিও-র লোকজন, পঞ্চানন মল্লিক, সম্পৎ রায়, তিলক রায়, বীরেন উকিল, সন্তোষ উকিল, হেমেনবাবু, উপেন বর্মন, মাদারি প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র এবং নারী চরিত্র—মাদারির মা, শ্রীদেবী, ধর্ষিতা মেয়েটি ও বাঘারুর মা। এই চরিত্রগুলির অধিকাংশই রাজবংশী সম্প্রদায়ের। মূলত তাদের জীবনযাপন, বিশ্বাস, সংগ্রাম, সমস্যা উপন্যাসের পর্বগুলিতে নানা ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। আর তা বর্ণিত হয়েছে তাদেরই ভাষা, রাজবংশী ভাষায়। বর্ণনার ভাষা বাংলা। আর সংলাপ বা কথোপকথনের ভাষা প্রধানত রাজবংশী। এছাড়াও আছে পূর্ববঙ্গের ভাটিয়াদের বঙালী ও মদেশিয়াদের নিজস্ব বুলি। সব মিলিয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষের বিশেষ ধরনের ভাষায় কথিত উপন্যাস। কিন্তু স্থান কাল পাত্রগত সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে একটি সর্বজনীন আবেদন উপন্যাসখানিকে মহত্ব দান করেছে। তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণের ফলে প্রাকৃতিক তিস্তার ইতিহাসের তিস্তায়, মানুষের তৈরি তিস্তায় রূপান্তর এবং তার ফলে তিস্তাপারের মানুষ, পশু, পাখি ও প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হবে তাতে বাঘারু মাদারি মাদারির মা'র মতো দরিদ্রতম মানুষেরা চিরবঞ্চনার ভেতরেই ডুবে থাকবে। আধুনিক উন্নয়ন, এমনকি কমিউনিস্ট প্রভাবিত বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নও তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। লেখকের কমিউনিস্ট মন সেই উত্তর বা সমাধান খুঁজতে বাঘারু ও মাদারির পিছু পিছু হেঁটে চলেছে নতুন নদী, নতুন বনপথে নতুন সূর্যোদয়ের দিকে।

রাজনীতি ঃ

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের ঘটনা মূলত ইতিহাস ও রাজনীতি কেন্দ্রিক। তিস্তার জল প্রবাহের মতো বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক বিশ্বাস, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তিস্তাপারের রাজবংশী, চা-বাগানের শ্রমিক, মদেশিয়া, ভাটিয়াদের জীবনকে ছুঁয়ে গেছে। ১৯৬৮ সালের তিস্তার বড় বন্যার পর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তিস্তাপারে জমি জরিপের কাজ শুরু হয়। গাজোলডোবায় তিস্তার বুকে ব্যারেজ নির্মাণ করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। জরিপের কাজে অফিসার হয়ে আসে সুহাস, এক সময়ের নক্শালিয়া। যে নকশালদের এক সময় কাজ ছিল 'জোতদার খতম', জোতদারদের জমি দখল—ঘটনাক্রমে সেই সুহাসকে মুখোমুখি হতে হয় গয়ানাথ, নাউছার আলম

প্রমুখ জোতদারদের সঙ্গে। গয়ানাথ এক ধুরন্ধর জোতদার। খাশজমির ব্যাপারে অনেক মামলা মোকদ্দমা সে সরকারের সঙ্গে লড়েছে, লড়ছে। নানা ভাবে গয়ানাথের দ্বারা সুহাসকে, সুহাসের লোকজনদের হাত করার চেষ্টা হয়। চারদিক আলোড়িত করে সুহাসের সমানে আবির্ভূত হয় একটি সর্বরিক্ত চরিত্র 'গয়ানাথের মানষি' বাঘারু। 'হু-জু-উ-র, মুই আসি গেইছু' বলে সে আত্মঘোষণা করে। সে দুটি কথা বলতে এসেছে বলে জানায় (এক) 'মোর' একখান ত জমি আছিল। আপল চাঁদ ফরেস্টের গা-লোগো। মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বলদ-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল কয়েক বছর। অ্যালয় আর নাই। মোর নামখান কাটি দাও।' (দুই) 'ত ঐ জমিখান মুই, ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন, ছাড়ি দিছু। লিখি দাও, শ্রী ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মনক এই জমিঠে উচ্ছেদ দেয়া গে-এ-এ-ই-ল'।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যখন জোতদারের জমি ভূমিহীন কৃষকদের দেওয়ার কর্মসূচি, তখন বাঘারুর জোতদার গয়ানাথের নামে জমি লিখে দেবার আর্জি বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে।

এরপর আসে জরিপ নিয়ে কৃষক নেতাদের বক্তৃতা, কৃষক-মজুর সংঘর্ষ—ঠাট্টা করে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'ভাষণ-সংগ্রাম' 'সম্মুখ সংগ্রাম', কৃষক-মজুর, ঐক্যের সংগ্রাম। এম, এল, এ-র জিপে করে ফুলবাড়ি যাত্রা রাজনৈতিক সমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্যে। পথে বাঘারুর সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা তার বিষয়ও রাজনৈতিক। বাঘারুর জন্মের ঘটনা বলতে গিয়ে মায়ের প্রসঙ্গে বাঘারু বলে "মোর মাওখান ত গয়ানাথেরই আছিল।"৩৬ জোতদারদের সর্বগ্রাসী চিত্র। বাঘারু, এম, এল, এর-র কাছে একখান জ্যান্ত এমেলিয়ার ঘর। বাগানিয়া মানষিক ঝান্ডা দিছেন, বস্তির মানষিক জমি দিছেন আর মোক একখান নাম দিবার না পারেন?' পরে এম, এল, এ, ফিরে চলে গয়ানাথের সঙ্গে বাঘারু বিষয়ে আলোচনার সময় বাঘারুকে আধিয়ারি দেওয়ার প্রসঙ্গে গয়ানাথ বিশ্বাস করে বাঘারু বোধ হয় এম, এল, এ-কে আধিয়ারির কথা বলেছে। গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করে—'উ কহিছে তোমাক? আধিয়ারি দিবার কাথা?' এম, এল, এ বলেন। না হয়, না হয়। মুই কহিছু।' তবুও ভুল বুঝে গয়ানাথ বাঘারুকে শাস্তি দেয় ডায়নার চরে নির্বাসনে পাঠিয়ে।

ক্রান্তির হাটে সুহাসের ক্যাম্পের ঘরে মণিবাবু গয়ানাথ ইঞ্জিনিয়ার ও ফুলবাড়ির লোকদের নিয়ে যে মিটিং তার বিষয়ও রাজনৈতিক, ব্রিজ বানানো নিয়ে। "এইসব মিটিং যেমন ভাঙে, এই মিটিংটাও তেমনি ভাঙতে শুরু করে। কথাবার্তা, ঝগড়াঝাটি, রাগারাগি, মিলমিশ এই সবের ভেতর দিয়ে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব আসে।"৩৭

ডায়নার চরে নির্বাসনে যাওয়ার পথে নিপুছাপুর চা বাগানের শ্রমিকদের প্রতিদিনের শ্রম-জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। সাতষট্টি, আটষট্টি, উনসত্তর অধ্যায়ে যথাক্রমে 'অর্থনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত,' কৃষি বিজ্ঞানের কিছু প্রক্ষিপ্ত' ও 'রাজনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত' অধ্যায়ে 'ফরেস্টের জমিতে জোতদারের আধিয়ারি, বাথান তৈরি, ফরেস্টে আধুনিক চাষের ফলে কীট নাশকের ব্যবস্থার ও পশু নিধন ও চীন ভারত যুদ্ধের পর ডুয়ার্সে মিলিটারি বেস তৈরি, এদের দুধ সাপ্লাইয়ের জন্য বাথানের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হয়েছে।

চরপর্বে চরুয়াদের কথা প্রসঙ্গে দেশভাগ, পূর্ববঙ্গাগত নমঃশূদ্র ভাটিয়াদের চরে বসবাস, তিস্তা নদীর জল-মাটির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া, এখানকার রাজবংশীদের সঙ্গে সম্পর্ক, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ, ইত্যাদি নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বন্যা বিধ্বস্ত সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অবস্থা ও উভয় দেশের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

বৃক্ষপর্বে লোভি গয়ানাথ ও তার জামাই আসিন্দিরের চারটি গাছ রক্ষা করার জন্য বাঘারুকে বন্যার তিস্তায় 'বাঘারু হে তুই ভাসি যা' বলে ভাসিয়ে দেয়। ভেসে আসা বাঘারুকে অশ্বিনী রায়দের ডুবন্ত চাল থেকে উদ্ধারের জন্য শুরু হয় রাজনৈতিক চাপান উতোর। মূলত কাদাখোয়া, নরেশ, অমূল্য বা তাকে উদ্ধার করলেও সরকারের রেডিও, টি.ভি এর প্রচার নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সংবর্ধনা দেওয়া হয় বাঘারু ও কাদাখোয়াকে।

মিছিল পর্বের মূল বিষয় বামফ্রন্টের উন্নয়নের কর্মসূচি হিসেব তিস্তা ব্যারেজ নির্মান ও সেই ব্যারেজের বিরোধিতায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ও অর্থনীতি রক্ষায় স্বাধীনকামতা পুর রাজ্য গঠন আন্দোলন। উত্তরখন্ড দল এক সম্মিলনের আয়োজন করে ময়নাগুড়িতে। ছ'দিনের সম্মেলনে প্রতিদিনই আসাম থেকে দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি থেকে আসা নেতারা জোরালো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন। শেষ দিনে সম্মিলনের ফাংশান কমিটি বোম্বের শ্রীদেবীর নাচের ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য সেই বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে পরের দিন জল্পেশ অভিযান করবে। উদ্দেশ্য সফল হয় না দুটি কারণে। প্রথমত রাজনৈতিক ভাবে এই কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য ময়নাগুড়ির বামফ্রন্টের এম, এল, এ হেমেনবাবু বা মন্ত্রী, আমলাদের নিয়ে জলপাইগুড়ির সার্কিট হাউসে বসে মিটিং করে সম্মিলন বন্ধের চেষ্টা ও জল্পেশ অভিযান স্থানান্তরে করাতে বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত শ্রীদেবীর নাচ দেখতে আসা দর্শকরা নাচ দেখে বাড়ি চলে যায়। ফলে গুটি কয়েক লোক নিয়ে জল্পেশ অভিযান হাস্যকর হয়। 'নিখিলবঙ্গ উত্তরখন্ড সমিতি' লেখা ফেস্টুন নিয়ে এগিয়ে চলা মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে— 'কামতাপুর রাজ্য কায়েম করো, কায়েম করো'। 'উত্তরখন্ড দিচ্ছে ডাক, ভোটের বাক্স খালি যাক।'

'কৃষকের জমি কাড়ি তিস্তা ব্যারেজ চলিবে না।' তিস্তা ব্যারেজের মিছিলে যোগ দিন যোগ দিন।'

'মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র'-এ এক অকল্পনীয় অবর্ণনীয় জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। মাদারির মায়ের রাষ্ট্র স্বতন্ত্র-ই বটে, বিশাল ভারতবর্ষের ভেতরেই এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অবস্থান। সে রাষ্ট্রে সে বনের ধারে পাতায় ছাওয়া ঘরে থাকে, বন থেকে শুকনো ডাল পালা কুড়োয় বনের ছোট ছোট জীবজন্তু মেরে খায়। তার-পাঁচ পাঁচটি পুরুষ জোটে পুরুষদের দ্বারা তার সন্তানও হয়। কিন্তু তাদের মাথা টেবিলের সমান উঁচু হলে কোথায় হাসিমারা, নেপাল চলে যায়। সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। শেষ সম্বল মাদারি। সেও তিস্তাব্যারেজের মিছিলে গিয়ে হারিয়ে যায়। সেও মিছিলে গিয়েছিল। কিন্তু একা ফিরে আসে। এসে ঢোকে সেই নির্জন পাতার কুড়ে ঘরে। বাকি জীবন ওখানেই কাটিয়ে একদিন সে ঐ ধূলো-মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

অসম্পূর্ণ তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন বৃত্তান্তের একটি বড় রাজনৈতিক ঘটনা। আসন্ন নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের মানুষের সমর্থন আদায় করার লক্ষে, উত্তরখন্ডের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য বামফ্রন্টের নেতামন্ত্রীরা তড়িঘড়ি অসম্পূর্ণ ব্যারেজ উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। সেই সঙ্গে তিস্তাব্যারেজ উদ্বোধনের বিরোধিতা ক'রে গয়ানাথ, তিলক বাঘারুদের যে মিছিলটা বেরিয়ে ছিল যা বামফ্রন্টের মিছিলের তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। সেটাকে পুলিশ দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে হারিয়ে যাওয়া মাদারিকে পুলিশ বাঘারুর হাতে তুলে দেয়। বাঘারু ও মাদারি ব্যারেজ দেখে, ব্যারেজের ওপর থেকে তিস্তাকে দেখে, আপলচাঁদকে দেখে। সব তার অচেনা মনে হয়। সে উন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে মাদারির হাত ধরে নতুন নদী নতুন ফরেস্টের খোঁজে হাঁটতে থাকে।

ভারতবর্ষের এমন কোটি কোটি বাঘারু, মাদারি, মাদারির মা-যা ব্যারেজের কেউ নয়, উন্নয়নের কেউ নয়, অর্থনীতির কেউ নয় তাদের প্রতি মমতা দেখিয়ে দেবেশ রায় বৃত্তান্ত সমাপ্ত করেন। রাজনীতির কথা উপন্যাসটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও আরও নানা বিষয়-এর বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়েছে।

নদী ও বন ঃ

তিস্তাপার, বন-নদী-পাহাড় বেষ্টিত ভূখন্ড। বন ও নদীই এখানকার মানুষের ওপর প্রভাব ফেলেছে বেশি। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে নদী ও বন যেন পৃথক চরিত্র হিসেবেই দেখা দিয়েছে। তাই উপন্যাসের স্বরূপ আলোচনায় নদী ও বন সঙ্গত কারণেই এসে পড়ে।

নদী এই উপন্যাসের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। তিস্তাপারের জীবন নিয়ে বৃত্তান্তের শুরু এবং যা

আপাত শেষ হলেও নদীর মতোই চলতেই থাকবে। সেই তিস্তার বন্যা, নৈসর্গিক শোভা ইত্যাদি উপন্যাসে সর্বত্র ব্যাপ্ত। জোতপর্বে তিস্তার পারেই জমি জরিপের কাজ শুরু। শেষও তিস্তার ঐ গাজোলডোবাতেই। তিস্তার ওপর উঠেছে মানুষের তৈরি 'মৈনাকের মাথা' তিস্তাব্যারেজ। বামফ্রন্টের উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অঙ্গ হিসেবেই তিস্তাব্যারেজ। তিস্তার নদী ভাঙ্গনেই আপল চাঁদের গাছপালা ভেঙ্গে নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে বলে চারচারটি গাছ ধরে আসিন্দির ও গয়ানাথ গাছগুলিকে কোথাও কোনো চরে বা কিনারে আটকাবার জন্য বাঘারুকে বন্যার দুরন্ত তিস্তায় ভাসিয়ে দেয়। বৃক্ষপর্ব জুড়ে চলে সেই তিস্তার ভয়ঙ্কর জলস্রোতের নানা বর্ণনা।

চরপর্বে তিস্তার বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য রংধামালি বাঁধে ওঠার জন্য নিতাইদের বা চরের মানুষের কতরকম চেষ্টা। বন্যা আসার অপেক্ষা থেকে শুরু করে বন্যা আসা, চর ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মানুষজনের নিরাপদ আশ্রয়ে গরুবাছুর, বিষয় আশয় নিয়ে বাঁধে তোলার নানা চিত্র এবং নদীর জল বাড়ার নানা দৃশ্য দেখা যায়। বন্যা তো রংধামালি রায়পুর অঞ্চলেই থেমে থাকে না। দোমোহানি, পদমতী ভাসিয়ে কাসিয়াবাড়ি হয়ে চলে যায় বাংলাদেশ সীমান্তে কত গ্রাম-গ্রামান্তরে। সেখানে বাংলাদেশের সীমান্তবাহিনীর কম্যান্ড্যান্ট ভারতের সীমান্ত বাহিনীর কম্যান্ড্যান্টকে ফোন করে না পেয়ে লোক পাঠিয়ে তাদের আশ্রয়ে যেতে বলে। ভারত যায়ও সেখানে। বন্যা দুদেশকে কীভাবে ভূগোল ও ইতিহাসে এক করে দেয়।

শুধু তিস্তা নয়, জলঢাকা, গয়েরকাটা, ডায়না ইত্যাদির কথাও উপন্যাসে এসেছে। ডায়নার চরেই বাঘারুর মোষের বাথানে নির্বাসন। ডায়নার বুকভরা পাথর আর স্বচ্ছ জলধারা তীব্র বেগে বয়ে চলার দৃশ্য অতুলনীয়। "....লম্বালম্বি ডায়নার অনেকটা একসঙ্গে দেখা যায় না, পাথর ও পাহাড়ের নদী এমনই ক্রমশ আড়াল হয়। নদীর বুকের কিছু অংশে, জলের দুপাশে, বালি। তারপর অনেকটা জুড়ে শুধুই পাথর, যেন মনে হয় পাহাড়কে পাহাড় ভেঙ্গে হঠাৎ ওখানে ছড়িয়ে আছে। ছোট ছোট পাহাড়ের সমান এমন বড়বড় পাথর নদীর মাঝখানে আলগা পড়ে আছে, যার মাথায় উঠতে মানুষের বুদ্ধি, আর বাঘ বা কুকুরের নখ দরকার। পাহাড়ের মত এত পাথর, নুড়ির মত ছড়িয়ে আছে বলেই চট করে বোঝা যায় না, নদীর সারাটা বুক বোল্ডারে ঠাসা কেন, যেন বাঁধানো বালিভূমি ও নদীখাত জুড়ে এত বোল্ডার পড়ে, মনে হতে পারে, এই পাহাড় পাহাড় পাথর দিয়ে নদীটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।"৩৮

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের নদীতে বালি আছে, পাথর আছে, পাড়ে বনের শোভা আছে, বিস্তৃত জনপদ আছে, মোষের বাথান আছে কিন্তু নেই নদীর বুকে পালতোলা নৌকা, মাছ ধরার নৌকা, নদীর জলে মাছ ধরে জীবন

জীবিকার ছবি। কিন্তু আছে তিস্তাকে দেবতা ভেবে তিস্তাবুড়ি রূপে পুজো দেওয়ার কাহিনি। আছে অসংখ্য গান, নদীর গান, তিস্তা বুড়ির গান।

তিস্তা শুধু তিস্তা নয়, তিস্তারবুড়ি। ব্যারেজ বন্ধ করার দাবিতে উত্তরখন্ড আন্দোলনে জল্পেশ্বর মন্দিরের সামনে তিস্তাবুড়ির গান গেয়েছে মেয়েরা। ময়নাগুড়ির বামফ্রন্টের এম, এল, এ হেমেনবাবুকে সেন্টিমেন্ট দিয়ে কোচবিহারের সন্তোষবাবু—তিস্তাবুড়ির প্রসঙ্গ তুলে রাজবংশী সমাজের কাজে তার ধর্মীয় গুরুত্বের কথা বলেছেন। এই তিস্তার বুকে ভেসে আসা বাঘারু যখন অশ্বিনী রায়ের টিনের চালায় আটকে গিয়ে সুপুরি গাছে উঠে বাঁধের লোকদের চোখের আড়ালে চলে গেল, তখনও একে 'কমলে কামিনী' দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে একটি 'মিথ' এর আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ঘটনা তিস্তাবুড়ির মাহাত্ম্য ছাড়া কী— এরকম ধারণা করা হয়েছে।

এভাবে নদী, বিশেষত তিস্তা উপন্যাসে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে গেছে।

তিস্তার গতি পথ ওপরে পাহাড় ও নিচু কিছুটা সমতল অংশ বাদে পুরোই বনভূমিতে ঢাকা। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তাই তিস্তা নদীর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ফরেস্টের কথাও সমান ভাবে বলা হয়েছে। উপন্যাসের শুরু তিস্তার পাড়ে গাজোলডোবায় আপল চাঁদ ফরেস্টে। গয়ানাথের জোতজমি শুধু চাষের জমিতেই সীমাবদ্ধ নয়। আপল চাঁদ ফরেস্টেরও কিছু অংশ তার দখলে। এই দখল নিয়ে হাইকোর্টে মামলা পর্যন্ত আছে।

বাঘারুর আর এক নাম ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন। তার মা 'গয়ানাথেরই মানষি' ফরেস্টে কাঠকুড়ুনির কাজ করত। ফরেস্টেই বাঘারুর জন্ম। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্রের জন্ম ফরেস্টে। ফরেস্টেই বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে পেছনে বাঘের থাবার চিহ্ন নিয়ে তার নাম হয়ে যায় বাঘারু। এই বাঘারু হওয়ার বৃত্তান্তও বাঘারু এম, এল, এ সাহেবকে শোনায় ফুলবাড়ি যাওয়ার সময় ফরেস্টের পথেই। জোতপর্বের উনিশ নম্বর অধ্যায়ে সুহাস জ্যোৎস্নাবাবুরা এক বৃষ্টিহীন মেঘহীন সকালে জমি জরিপের কাজে বেরিয়ে 'মালহাটি' নামে এক ফরেস্ট পায়। এই নামে একটা চাবাগানও আছে। ওরা ফরেস্টটাকে বাঁ হাতে রেখে হাঁটতে থাকে। "ডাইনে তাকালে কালচে সবুজ ঘন ঘাসের প্রান্তর, আর বাঁয়ে তাকালে নিশ্চিদ্র প্রায়ান্ধকার জঙ্গল—গাছের কান্ডগুলোও জঙ্গলের সবুজে ঢাকা, শ্যাওলায় বা লতায়।"৩৯ বনপর্বের সাতষট্টি, আটষট্টি ও উনসত্তর অধ্যায়ে বন, বনে গোরু মোষের বাথান, বনে কাঠচুরি, পশু শিকারীদের কথা, চাষবাসের কথা ও বনে মিলিটারি ক্যাম্পের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। শীতের সময় বনে আগুন লাগিয়ে বন সাফ করা হয়। "আগুন লাগানোর পর

সারাটা ফরেস্ট কেমন খালি খালি লাগে। তলায় তলায় বহুদূর পর্যন্ত চোখ চলে যেতে পারে—এক নদীর পার থেকে আর এক নদীর আর এক পার।.....

....কখন এক সময় নতুন ঘাস গজানো শুরু হয়ে যায়। ফরেস্টের মাটি দেখতে দেখতে কচি কচি ঘাসে ভরে যায়। দেখতে দেখতে পোড়া জঙ্গল জুড়ে এই সবুজ নতুন ঘাস লক লক করে ওঠে। সেই সময়ে গরু আর মোষের বাথানে বিভিন্ন এলাকা ভরে উঠতে থাকে।"৪০

বাথান ছাড়াও বাথানের মালিকরা ফরেস্টের পতিত জমিতে চাষবাস শুরু করে। 'এটাকে দুদিক থেকেই দেখা যায় ফরেস্টের জমিতে জোতদারের আধিয়ারি বা ডুয়ার্সের গভীর অরণ্যে কৃষি কর্মের বিস্তার।'

ফলে অন্য একটা সমস্যা তৈরি হয় ফরেস্টে। ফরেস্টের জমিতে কলা, ধান, পোকার হাত থেকে পাখির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক ওষুধ দিতে হয়। সেই ওষুধের মেশানো ধান খেয়ে হরিণ, গন্ডার, বুনো মোষ ইত্যাদি মারা পড়ে। তাদের মাংস খেয়ে আবার শিয়াল, বাঘও মারা যায়। অবশ্য 'জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে অবস্থা এখনো অতটা খারাপ নয়।'

১৯৬২ সালের চীন ভারত যুদ্ধের পর শিলিগুড়ির উত্তরে আসাম পর্যন্ত, হাইওয়ের দুপাশে জঙ্গল পরিষ্কার করে মিলিটারির ক্যাম্প বসল। বনের ভেতরটা পরিষ্কার করে পাকাবাড়ি, পাকা রাস্তা, তৈরি হলো। ফরেস্টের বড় বড় গাছ থেকেই গেল, তলাটা সাফ করে নেওয়া হল। 'সত্তর' অধ্যায়ে বাঘারুর 'নির্বাসনভূমি'—ডায়নার চর। ডায়না চর তো জঙ্গল। ডায়নার মাঝখানের গা বেয়ে ফরেস্ট উঠে গেছে খাড়া ও ধনুকের মত বাঁকা। ডায়নার মাঝখানের চরটাতেও জঙ্গল। 'এইসব চরের জঙ্গল বাড়ি—ঘাসবাড়িতে একমাত্র ভয় গো বাঘার।' বাঘারু যে বাথানে থাকে তার প্রায় চারদিকেই জঙ্গল। সেখান থেকে পাখির ডাক, বনমোরগের ডাক শোনে। 'একাত্তর' অধ্যায়ে এরকম একটি পাখির 'ডায়নার ওপরে, জঙ্গলের ভেতরে কোনো উঁচু ডালে' ক-অ-অ-ক-ধ্বনি শুনতে পায়।

'আটাত্তর' অধ্যায়ে 'বাঘারু বাড়ি'তে বাঘারু এক বুড়িয়াল মোষের পিঠে শুয়ে শুয়ে ভাবে—'এই বুড়িয়ালটা গয়ানাথের। এই বাঘারুখান গয়ানাথের, এই জঙ্গল খান গয়ানাথের। ....বাঘারু আকাশের দিকে তাকিয়ে বনের গাছগুলো দেখে আর চেনে, এইঠে কোশল বাড়ি (হরিতকি গাছের জঙ্গল) শুরু হয়্যা গেইল। তামান বনত এইঠে সুধু ধর কেনে পঁচিশ তিরিশ খান কোশল গাছ আছে। আর কোটত নাই। কোনা মারা পাতা খান, আর গুলটি মারা ডাটখান। ...বাঘারু এই জায়গাটার নাম দিয়েছে 'কোশলবাড়ি'। 'আশি' অধ্যায়ে বাঘারু

চোরাই গাছ কাঠুরেদের পরিচয় পায়। তারা বাঘারুর চারটি মোষ দিয়ে তাদের গাছ বয়ে নিয়ে যায়।

চরপর্বের 'উননব্বই' অধ্যায়ে রাজবংশীরা বনান্তরাল থেকে তিস্তাকে নিসর্গের মতো ব্যবহার করত প্রসঙ্গে নিসর্গের একটি যে বন তা উঠে এসেছে। "এ যেন এই নিসর্গের মতই ব্যবহার-জলপাইগুড়ির এই নিসর্গ যেখানে গহনতম ফরেস্ট নদীর জলপ্রান্তর কে আড়াল দিয়ে রাখে, যেখানে পাহাড়ের ঘের সেই ফরেস্টকে ঘিরে রাখে। যেন মনে হয় এ নিসর্গকে দেখতে পারে, পাহাড় বন নদী দিয়ে ঘেরা, পাহাড়-বন-নদী দিয়েই তৈরি এক রক্ষিত নিসর্গের মত। দেখাতে পারে যে ঘিরে রাখা পাহাড় থেকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে এই নদী বন-পাহাড়, যেন, এখানে এই ঘেরের মধ্যেই থাকবে বলে।"৪১

বৃক্ষ পর্বের 'একশ কুড়ি' অধ্যায়ে আবার আপল চাঁদ ফরেস্টে রাত তিনটার সময় ফিরে আসা। বন্যার তোড়ে ফরেস্ট ভাঙছে। গয়ানাথ ও তার জামাই আসিন্দির অপেক্ষা করে আছে গাছ ভেঙ্গে পড়লেই ধরবে, বা ভাঙার সম্ভাবনা দেখা দিলেই বাঘারুকে দিয়ে কাটিয়ে নেবে। এরকম চারটি গাছ এক সঙ্গে বেঁধে সেগুলোকে নিরাপদ স্থানে পাঠাবার জন্য—বিপদ সঙ্কুল বন্যার তিস্তায় বাঘারুকে গাছের সঙ্গে ভাসিয়ে দেয় তারা। সারাটা পর্ব জুড়ে বাঘারুর ভেসে চলার কাহিনি। শেষে গাছ সহ বাঘারু উদ্ধারের ঘটনা।

মিছিল পর্বে 'একশ নব্বই' অধ্যায়ে 'তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের দিন উত্তরখন্ডীরা চ্যাংমারি ব্যারেজের রাস্তাটা বেছে নেয়, কারণ, ক্রান্তি হাটের পাকা রাস্তা সেদিন বামফ্রন্ট ও সরকারের দখলে। তাই ওদের মিছিল, দু'দিক থেকে আসা মিছিল আপল চাঁদের ভেতরে ঢুকে এক হয়ে যায়। সামনে ঝান্ডা হাতে বাঘারু।

"আপলচাঁদ বাঘারুর। বাঘারু আপলচাঁদের। তার পায়ের চাপে এর শুকনো পাতা ভেঙ্গে যায়। তার হাত নাড়ালে এ ফরেস্টের আপাত দুর্ভেদ্য বাধা দূর হয়ে যায়। এই ফরেস্টের ভেতরেই কোথাও তার জন্ম হয়েছিল। এই ফরেস্টের ভেতরই বাঘ তার পিঠে ও উরুতে সিল মেরে দিয়েছে যে সে আপলচাঁদের।"৪২

বাঘারুর সঙ্গে আপলচাঁদের সম্পর্ক কত নিবিড় তা বোঝা যায় এই বর্ণনায়—"এখানে এই আপলচাঁদে বাঘারু না দেখলে একটা বিরাট লাম্পাতি গাছের বাড় আটকে যায়। কী লাভ বেড়ে যদি বাঘারুই না দেখে? এখানে এই আপলচাঁদের একটা লতার কুঁড়ির ফুল আটকে যায় বাঘারু না দেখলে। কী লাভ বেড়ে যদি বাঘারুই না দেখে? এখানে এই তিস্তার একটা স্রোতের একটু উদাসীন সরে যাওয়াও থমকে যায় বাঘারু না দেখলে। কী লাভ সরে গিয়ে যদি বাঘারু না দেখে।"৪৩

অন্ত্যপর্বে মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র এ 'মাদারির মা-র ঘর ফরেস্টের সীমায় রাস্তা থেকে দেখলে ওটাকে

ফরেস্টের সীমা মনে হতেই পারে। ন্যাশানাল হাইওয়ের পরে খানিকটা জমি তারপর ফরেস্ট।' জায়গাটা নিচু, বর্ষাকালে জল জমে থাকে। পাশে ঝোরা। 'মাদারির মা রাস্তার ঠিক পাশে, ঝোরার ভেতর থেকে ওঠা একটা শ্যাওড়া গাছের তলায় কয়েকটা পাথর বসিয়ে একটা বেদি মত বানিয়েছে।' এটাই হয়ে উঠেছে 'বৃক্ষদেবতা'। 'এখানেই একটু ফাঁকাতে নানা পাতায় ছাওয়া মাদারির মা-র ঘর।' এই ঘরের পেছনের জঙ্গলেই মাদারির মার জীবন জীবিকার স্থল। বনের সরু ডাল কুড়িয়ে, ছোট ছোট পশু শিকার করে তার দিন গুজরান। 'সারাদিন ফরেস্টের ভেতরে ভেতরে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়—ঘুরে বেড়াতে হয় মাটিতে চোখ রেখেই। ফরেস্টের ভেতরে তো আর মাটি দেখা যায় না, 'শুধু বুনো লতা পাতা আর ঘাস'।

'একশ সাতানব্বই' অধ্যায়ে দার্জিলিংয়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ির সম্পর্ক বোঝাতে দুই জেলার সীমানার জঙ্গল পাহাড়ও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মত।

"জলপাইগুড়ি জেলার ওদলাবাড়ি থেকে গরুবাথানের রাস্তা সোজা উঠে গেছে লাভা আলগাড়া হয়ে কালিম্পং। দার্জিলিং পাহাড় থেকে কালিম্পং পাহাড় আলাদা। আর, এই কালিম্পং পাহাড়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ির সংযোগ অনেক প্রাচীন। এই গরুবাথানের রাস্তায় বা লাভা আলগাড়ার রাস্তায় বা সরকারি ভাষায় ওল্ড মিলিটারী রোডে জলপাইগুড়ির অনেক চা বাগান ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পাহাড়ে উঠে গেছে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঢুকে গেছে, পাহাড়ের আড়াল থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছে। পাথরঝোরা, শুড়িবাড়ি, ছোট ফাগু, বড় ফাগু। আবার এই সব পাহাড় জুড়েই উঠে গেছে জলপাইগুড়ি-ডিভিশনের অধীনে ফরেস্টের নানা রেঞ্জ।"৪৪

তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের দিন সেই শ্যাওড়া ঝোরা থেকে গাজোলডোবা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা জুড়েই তো বন-পাহাড়-নদী। মিছিলের ট্রাকগুলি সেই নদী জঙ্গল পার হয়েই ব্যারেজের স্থানে উপস্থিত হয়। ট্রাকে "মাদারির মা যেখানে বসেছিল সেখান থেকে দেখা যায় যেন পাহাড়গুলো পেছন থেকে ছুটে আসছে।... আবার কোনো এক সময় পাহাড়ের দেয়ালটা ভেঙে যায় যেন। বরং বাঁ দিকে তাকালে সে দেখে টানা খাদ চলেছে, আর সেই খাদের ভেতরে নদী, ঝোরা, চা-বাগান, চাষক্ষেত, দূরে দূরে ফরেস্ট।"৪৫

চরিত্র ঃ বাঘারু

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বহু চরিত্রের সমাবেশ। এখানে সুহাসের মতো জরিপ-অফিসার, এক সময়ের নক্‌শালিয়া যেমন আছে তেমনি আছে গয়ানাথের মতো ধূর্ত জোতদার, আছে তার 'মানষি' বাঘারু, আছে বামফ্রন্ট

সরকারের এম, এল, এ, কৃষক আন্দোলনের কর্মী ও নেতা, উত্তরখন্ড আন্দোলনের কর্মী ও নেতা, ইঞ্জিনিয়ার, মন্ত্রী, মদেশিয়া, ভাটিয়া নানা চরিত্র। আর আছে মাদারি ও মাদারির মা। প্রকৃত পক্ষে নারী চরিত্র একটিই— মাদারির মা। তবে পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে শ্রীদেবী ও সীমান্তে ভেজা শরীরে, ভেজা মাটিতে ধর্ষিতা একটি মেয়ে নিয়ে মোট তিনটি নারী চরিত্র।

প্রতিটি চরিত্রই প্রয়োজনীয় এক এক সময়ে এক এক পরিবেশে এদের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। এমনকি পার্শ্ব চরিত্র শ্রীদেবী উত্তরখন্ডের সম্মিলনের ফাংশানে প্রধান চরিত্রের ভূমিকা পালন করে। তাঁর উপস্থিতি উপলক্ষে সারা উত্তরবঙ্গ এমনকি আসাম-বিহারের বাংলা সংলগ্ন অংশ তোলপাড় হয়ে ওঠে।

সুহাস-প্রিয়নাথ, গয়ানাথ-আসিন্দির, হৃষিকেশ-রাধাবল্লভ, পঞ্চানন, বীরেন, মাদারি-মাদারির মা, বাঘারু-কাদাখোয়া, ইত্যাদি চরিত্র উপন্যাসে এক এক স্থানে এক একটি স্তম্ভ স্বরূপ। উপন্যাসে বিভিন্ন অধ্যায়ে এরা প্রধান চরিত্র। এতো চরিত্রের পৃথক পৃথক আলোচনা সন্দর্ভের কলেবর বৃদ্ধি করবে বলে শুধু বাঘারু চরিত্রটিই আলোচনায় আনা হলো। আশা করি বাঘারুকে দিয়ে অনেককেই ছোঁয়া যাবে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র একমাত্র 'চরপর্ব' বাদে সারা উপন্যাস জুড়ে বাঘারুর উপস্থিতি। উপন্যাসে বর্ণিত সমাজে বাঘারুর অবস্থান, তার একাকীত্ব, ব্যক্তিত্বহীনতা, অস্তিত্বহীন উপস্থিতি, তার সংলাপ, নেতিবাচক জীবন ইত্যাদি লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে, সংবেদনশীল হয়ে অঙ্কন করেছেন। এ কোনো টাইপ চরিত্র নয়। দেবেশ রায় তাঁর মফস্বলি বৃত্তান্তে খেতখেতু, চ্যারকেটু, টুলটুলি, ব্যাঙ্গুদের মতো ভুখা চরিত্র এঁকেছেন। কিন্তু বাঘারু সে সব চরিত্র থেকে আলাদা। তার দারিদ্র্য এ যাবৎ কালের পরিচিত সংস্কারে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বাঘারু এক এবং অদ্বিতীয়।

বাঘারুর দারিদ্র্য তার অস্তিত্বে। তার কোনো সত্যিকারের নাম নেই। তার মা ফরেস্টে কাঠ, ডালপালা কুড়ায় বলে তাকে কেউ কেউ 'কুড়িনীয়ার ছোয়া' বলে ডাকে। ফরেস্টেই তার জন্ম এবং জন্মের সময় তার মা নিঃসঙ্গ অবস্থায় কুড়াল দিয়ে নাড়ি কেটে ছিল বলে তার নাম হয়েছে 'কুড়ালিয়া কাটা'। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে পেছনে বাঘের থাবার চিহ্ন বহন করে আছে বলে তার নাম 'বাঘারু'। জমি জরিপের হাকিমের সামনে তার আত্মপরিচয় 'মুই ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন।' কিন্তু কোনোটাই তো তার আসল নাম নয়। তাই এম, এল এ সাহেবের কাছে একটা ছোট নাম সে চেয়েছে। এতো অজস্র নেতিবাচক পরিচয়ের মধ্যে তার একটা ইতিবাচক পরিচয় সে 'গয়ানাথের মানষি,' তার মাও গয়ানাথেরই মানষি। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন আত্ম পরিহাস

আর দেখা যায় না।

বাঘারুর অস্তিত্ব সমগ্র উপন্যাসে শুধু 'গয়ানাথের মানষি' হিসেবে। তার শরীরটা যেন শালগাছ, তার আয়ত্বাধীন নয়। গয়ানাথ যখন যে কাজে লাগাতে চায় সেই কাজে লাগে। এম, এল, এ কে পিঠে করে নদী পার করে দেওয়া, আদেশমাত্র ডায়নার চরে চলে যাওয়া-গোরু মোষের মতো জীবন কাটানো, বন্যায় ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় গাছ কেটে তা ভাসিয়ে দিয়ে সে গাছ রক্ষার জন্য গাছের সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া উত্তাল তিস্তার জলে এ এক অবিশ্বাস্য আনুগত্য—যা একান্তভাবেই শারীরিক।

বনপর্বে বাঘারু যেন খানিকটা অন্য মানুষ। নির্বাসনভূমির দিকে যাত্রা যেন পৌরাণিক মহাপ্রস্থানের তুল্য। পথে অস্ত্রলাভ। তারিকাপাতা জোগাড় করা পাতা কাটার জন্য পাথর খোঁজা, কুকুরের সঙ্গ লাভ—সবই তার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাই এর মধ্যে এতো ডিটেলস।

চরপর্বে বাঘারু অনুপস্থিত। কিন্তু সেখানে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে পরোক্ষে বাঘারু যুক্ত হয়ে যায়। এরপর নির্বাসন থেকে বাঘারু ফেরে গয়ানাথেরই প্রয়োজনে। আপল চাঁদ ফরেস্ট বাঁচানোর জন্য গয়নাথের আদেশে বাগারুকে ভাসতে হয় তিস্তার জলে গাছের সঙ্গে। এক সময় চরের বাড়ির টিনের চালে তাকে দেখা যায়। তাকে উদ্ধারের জন্য সরকারি প্রচেষ্টা হয়। টিভির লোকজন এসে ছবি তোলে।

মিছিল পর্বেও দেখা যায় বাঘারু গয়ানাথের হুকুম মতো উত্তরখন্ড আন্দোলনে সামিল। ময়নাগুড়িতে উত্তরখন্ডের সম্মেলন। সম্মেলন ঘিরে ফাংশান। শ্রীদেবীর রমননৃত্য। বাঘারুও সেই নৃত্যের সামনে দাঁড়ানো। দুই নগ্নতা মুখোমুখি। পরের দিন জল্পেশ যাত্রা। ব্যারেজের বিরুদ্ধে শ্লোগান। এখানেই তিলক রায়বর্মনের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে বাঘারু তার আসল পরিচয়টা ব্যক্ত করে—'হামরালার-কুনো মানষি নাই। হামরালার কুনো খন্ড নাই, কুনো জয়েন নাই/ 'মুই রাজবংশী না হও'/'মুই ভাটিয়া না হও'/'মুই এই ঠেকার না হয়'/' মোর কুনো পার্টি নাই'/'মোর কুনো ঝান্ডা নাই'।

তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের দিনে আবার বাঘারুকে তো কোনা ঝান্ডা কাঁধে ব্যারেজের বিপক্ষের মিছিলে দেখা যায়। ব্যারেজের পক্ষেও বামপন্থী মিছিল চলে। যে আপল চাঁদের সঙ্গে তার আজন্ম সম্পর্ক তার ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই সে দেখে আলোক মালায় সজ্জিত; উদ্বোধনের অপেক্ষায় তিস্তা ব্যারেজ যার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার কোনো মিল নেই।

উদ্বোধনের মিটিং জমে ওঠে। হাজার হাজার মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ে মাদারি ও মাদারির মাও এসেছিল।

মাদারির মা ভিড়ের মধ্যে তার হারানো সন্তানদের খোঁজে। এক সময় তার একমাত্র সম্বল মাদারিকেও হারিয়ে ফেলে। তাকে একাই যেতে হবে সেই শ্যাওড়া ঝোরার কুটিরে। এই উদ্বোধন উন্নয়নের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্কই নেই।

বাঘারু ঝান্ডা ফেলে উদ্বোধন মঞ্চের দিকে এগোয়। পুলিশ বাধা দিলে সে বলে—'মোর কুনো মিছিল নাই, 'মুই মিটিংয়ের মানষি না হই।'—এই সময় হারিয়ে যাওয়া মাদারির সঙ্গে বাঘারুর মিলন ঘটিয়ে দেয় পুলিশ। দুজনের সংলাপে ব্যারেজ শাসিত অচেনা তিস্তাকে তারা দেখে। ফিরে যায় আপলচাঁদে—যেখানে থেকে ব্যারেজ উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন ফরেস্ট, নতুন নদীর সন্ধানে কেবল হাঁটতেই থাকে দুজনে। লেখকও চান 'এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে 'হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক'।

ইউরোপীয় মডেলকে অস্বীকার করে পুরাণের আবহ তৈরি করে সম্পূর্ণ নতুন রীতিতে লেখা উপন্যাসে দেবেশ তার দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাসকে নবতর অন্বেষণমুখী করেছেন। বৃত্তান্ত তো শেষ হয় না, বিশ্বাস তো শেষ হয় না, বাঘারুদের প্রাকৃতিক জীবন উন্নয়নের কতটুকু স্পর্শ পায়, আদৌ পায় কী! তাদের হাঁটা ছাড়া উপায় কী! বাঘারুর সঙ্গে শুধু মাদারি নয়—লেখকও হাঁটছেন নতুন সূর্যোদয়ের আশায়। 'বাঘারু' সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"পরিবর্তমান ভূ-প্রকৃতি এবং আর্থ সামাজিক পটে বাঘারুর অপরিবর্তনীয়তা আর ভাঙচুরের—বাঘারুর নতুন নতুন মূর্তির দ্বান্দ্বিকতা শ্রমনিষ্ঠ কব্জিতে ও মেধাবী প্রত্যয়ে লেখক গড়ে তোলেন, হয়তো বা ভাস্করের পাথুরে কাজের সঙ্গেই তার তুলনা। কখনও বা লোককথার প্রাচীন উপাদান প্রতিমায়িত হয় বাঘারুর একান্ত লৌকিক অথচ ব্যক্তিক অনুভূতি। বাঘারুর শারীরিকতা এবং প্রাচীনতার ছন্দকে দেশকালের তরঙ্গায়িত পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে এ বৃত্তান্ত বিস্তার পায়।"[৪৬] এই আলোচনার শেষ অংশে তিনি আবার বলেছেন—"প্রকৃতি বনাম বাঘারু, পরিবর্তনমান সমাজ বনাম বাঘারু, বাঘারু বনাম বাঘারু— দেখতে দেখতে মনে হয় আর সবই অলীক। মাদারিকে নিয়ে হাঁটতে থাকুন বাঘারু। বাঘারুই ভারতবর্ষ।"[৪৭]

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত এক মহাকাব্য

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' আলোচনায় নিশ্চিতভাবেই জেগে ওঠে মহাকাব্যের স্মৃতি। উপন্যাসটির গঠন ও বিষয় সংরচনায় ভারতীয় মহাকাব্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নজরে আসে।

রামায়ণ, মহাভারতাদি মহাকাব্যগুলিতে যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন ধরা পড়েছে তা উচ্চবর্ণের, রাজা

মহারাজাদের। কিন্তু তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ঠিক তার বিপরীতে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর, সেই সঙ্গে সমাজের নানাস্তরের মানুষের। যে উচ্চবিত্তের উচ্চ বর্ণের মানুষের কথা আমরা মহাকাব্যের এতোদিনের সংস্কারে জেনেছি, বিশ শতকের শেষ পর্বের এই নবমহাকাব্যে আমরা দেখতে পেলাম তার প্রতিবাদ, অন্তবর্গীয় মানুষের জয়পরাজয়, আশা আকাঙ্ক্ষার বহু কৌণিক উপাখ্যান।

এই উপন্যাসে একই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর গোষ্ঠী পরিচয়। মহাকাব্যের ভাষায় বংশ পরিচয়, রাজবংশী সমাজের হৃতগৌরব হৃত রাজ্য ফিরে পাবার আন্দোলন, রাজবংশী সমাজেরই একজন সর্বরিক্ত চরিত্র বাঘারুর (নায়ক চরিত্র) নেতিবাচক জীবন কাহিনি ও একই জনগোষ্ঠীর জোতদারের দ্বারা চূড়ান্ত শোষণ ও বঞ্চনার কাহিনি, সব শেষে বামপন্থী সরকারকৃত তিস্তা ব্যারেজের উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য কোথাও যাত্রা করার আখ্যান।

প্রশ্ন হতে পারে, বৃত্তান্তের পটভূমি কেবল তিস্তাপার। এখানকার রাজবংশীদের জাতি-ধর্ম-বংশ ইত্যাদি বর্ণন কি সারা ভারতের দর্পণ হতে পারে? উত্তরে রামায়ণ-মহাভারতের পটভূমি উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও তো কাহিনির উৎসকেন্দ্র মূলত উত্তরভারত। দক্ষিণ ভারত তো অন্য দেশ। সেখানকার বর্ণিত সংস্কৃতি, ভাষা আচার আচরণ সবই উত্তর ভারতীয়। বরং দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্তে যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় তা সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বহু জনগোষ্ঠীর আত্মচেতনা বৃদ্ধি-হেতু স্ব-মর্যাদা-স্বভূমি পুনরুদ্ধারের কাহিনির সমান। ভারত স্বাধীন হওয়ার অর্দ্ধশতাব্দী পরেও যখন নানা ভাষা, নানা মতের দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি তখন সঙ্গত কারণে নানা স্থানে তা অধিকার অর্জনের লড়াইরূপে দেখা দিয়েছে। সরকার তাদের অনেকের দাবি মেনে নতুন নতুন রাজ্যও তৈরি করে দিয়েছেন। সুতরাং সেই দিক থেকে রাজবংশীদের উত্তরখন্ডের আন্দোলনের ঘটনা-প্রতীকে সমগ্র ভারতচিত্রই এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। এপথেই সমাধান আসবে কিনা তা বলা যায় না। কিন্তু লেখক এ আন্দোলনের উল্লেখ করে উপন্যাসের মহাকাব্য লক্ষণের বংশবর্ণন ও রাজ্যদাবি এ দুটি উপাদান তুলে ধরেছেন।

ব্যষ্টি জীবনের মধ্য দিয়েই সমষ্টির ইতিহাসকে ছোঁয়া আধুনিক মহাকাব্যের আর একটি বিশেষ লক্ষণ। রামায়ণ মহাভারতেও তার পরিচয় মেলে। এখানে তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের সংকট দিয়েই

উপন্যাসের সূত্রপাত। আর এই ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে কোনো পৌরাণিক মহাকাব্যের চরিত্রের আবির্ভাবের মতো করেই।

দেবেশ রায়ের এ উপন্যাসের নায়ক অবশ্যই ধীরোদাও সদবংশ জাত কোনো রাজপুরুষনয়, একান্ত ভাবেই একালের সহায় সম্বলহীন, নাম গোত্রহীন, সর্বাবয়বে বঞ্চনার চিহ্ন নিয়ে রিক্ততার মূর্ত প্রতীক বাঘারু বর্মন।

তিস্তাপারের ক্রান্তি হাটে এক হল্কা ক্যাম্প বসেছে। সেখানে 'জমিজমা মাপামাপি হবে। কোন জমি কার এইসব। তার ওপর কোন জমিতে কে চাষ করছে সে সব রেকর্ড হবে।' এই কাজে ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুহাসের সামনে এসে এলাকার লোকজন নিজ নিজ তথ্যাদি পেশ করছে। সেখানেই বাঘারু এসে হাজির হয়। তার উপস্থিত হওয়া যেন আবির্ভূত হওয়া। যেন ত্রিলোক কম্পিত করে তার আর্বিভাব ঘটে। এবং সে তার আবির্ভাব ঘোষণা করে। 'হুজুর মুই আসি গেছু, মুই ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন।' তারপর সে গম্ভীর কণ্ঠে ফের ঘোষণা করে 'শুন হুজুর, কাথা মোর একখান। না হে একখান না হয় দুইখান। কাথা মোর দুইখান।' একখান কাথা মোর নামখান কাটি দাও। ঐ জমিখান লিখি দাও গয়ানাথ জোতদারের নামত।' দুইখান কাথা'র আর একটি হলো তার নাম প্রসঙ্গ। তার তো সত্যিকারের কোন নাম নেই। ফরেস্টে জন্ম বলে ফরেস্টার। আর বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে বাঘ তার পেছনে থাবা মেরে ছিল বলে 'বাঘারু'। দুয়ে মিলে ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন। আপলচাঁদের কাছে সামান্য কিছু জমিতে যে চাষ করত তার স্বত্বও গয়ানাথকে দিয়ে সে কেবলই 'গয়ানাথের মানষি' হতে চায়। একখানা কটি বস্ত্র সম্বল করে এমন একজন নিরলম্ব মানুষের পুরানো শালগাছের মত শ্যাওলা ধরা শরীর নিয়ে নায়ক রূপে আত্মপ্রকাশ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

মহাকাব্যের নায়কদের যুদ্ধ আছে, কীর্তি আছে, জয় আছে খ্যাতি আছে। বাঘারুও বহু কীর্তির অধিকারী। সে স্থানীয় এম, এল, এ কে পিঠে করে নদী পার করে দেয়; সেটেলমেন্টের অফিসার-সুহাসবাবুর সামনে গয়ানাথের ইঙ্গিত মাত্র তিস্তায় ঝাপ দিয়ে সাঁতার কেটে সীমানা নির্দেশ করে; আদেশ মাত্র ডায়নার চরে যাত্রা করে। যাত্রাকালে 'বাঘারুর অস্ত্রলাভ' 'সঙ্গীলাভ' হয়। এ যাত্রা সাধারণ যাত্রা নয়, নির্বাসন-মহাকাব্যের নায়কদের মতো। আবার তিস্তার বন্যায় গয়ানাথের গাছ বাঁচানোর জন্যে উত্তাল জলরাশিতে নিজেকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্দ্বিধায় ঝাপিয়ে পড়ে অনির্দিষ্ট স্থান ও কালের দিকে যাত্রা করে। নিতাইদের চরের কাছে অশ্বিনী রায়দের ডুবন্ত চালে আটকে যায়। মহাকাব্যের নায়কের অভিনব, উৎকৃষ্ট কর্মগুলি এসময়েই দেখতে পাওয়া যায়। এই

সময়ের এপিসোড বা অধ্যায়গুলির নাম 'অন্ধকার জলস্রোতের মাঝখানে', 'জলস্রোতে বৃক্ষবাহন', 'দুই আঘাতের মাঝখানে',

বৃক্ষপর্বে কয়েকদিন বানের জলে ভেসে উদ্ধার হলে বাঘারু হয়ে ওঠে সংবাদ। দূরদর্শনের চিত্রশিল্পীরা এসে নানা 'পোজে' তার ছবি নেয়। "টিভি-র ক্যামেরাম্যান অবিশ্যি একেবারে তলা তেকে আকাশ পর্যন্ত একটা দারুণ প্যানিং করেছে-বন্যার জল, ক্লোজ আপে আবর্ত, গাছের ডালপালায় জলের স্রোতের আঘাত, আরো ডালপালা, বাঘারুর দুটো পা-ক্লোজ আপে, ধীরে ধীরে হাঁটু, উরু কোমর, নেংটি মিডিয়াম শটে পেট, বুক তারপর মাথা। সেখান থেকে বাঘারু ধীরে ধীরে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, আকাশে নদীতে স্থাপিত হয়।"৪৮

মিছিল পর্বে বাঘারু উত্তরখন্ডের মিছিলের পুরোভাগে ঝান্ডা হাতে। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় নয়—গয়ানাথের নির্দেশে, মিছিলে বহু লোকের সঙ্গে থেকেও সে একা। নেতা তিলক রায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে 'মোর কোন পার্টি নাই, 'মোর কুনো মানষি নাই', 'মোর কুনো ঝান্ডা নাই।' ব্যারেজ উদ্বোধনে এসে এক সময় ঝান্ডা ফেলে সে একা এগোতে থাকে। এতোদিন গয়ানাথের মানষি বলে সে পরিচয় দিত, আজ সে তাও নয়—না রাজবংশী, না ভাটিয়া, না উত্তরখন্ডী না বামপন্থী। সে কেবল একা বাঘারু। ব্যারেজ বদলে দিয়েছে ফরেস্ট বদলে দিয়েছে তিস্তা—তার চেনা প্রকৃতি। এখানে যে উন্নয়নের বাজনা বাজছে তা আর যার হোক বাঘারুর নয়। তাই একবার ব্যারেজের তিস্তাকে দেখে সে একা হাঁটে। লেখক অবশ্য তার সঙ্গে জুড়ে দেয় আর এক মা হারিয়ে যাওয়া কিশোর-মাদারিকে। যেন জয়-যুদ্ধ-অভিযান শেষ করে মহাকাব্যের নায়ক মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ায় সঙ্গী—নতুন স্বপ্ন ও আসার প্রতীক মাদারি। মহাভারতে পান্ডবদের গন্তব্যস্থল ছিল স্বর্গ। কিন্তু এখানে গতি আছে নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। গন্তব্যের সন্ধানে শুধু হাঁটা আর হাঁটা।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র স্বরূপ বিচার করে দেখা গেল এই উপন্যাস খানিতে উপন্যাসের নানা শ্রেণি লক্ষণ বিদ্যমান। তিস্তাপার নামক একটি বিশেষ ভূখন্ডে একটি বিশেষ সম্প্রদায় রাজবংশী সমাজের, তাদের ভাষায় রচিত তাদেরই জীবন যাপন ও জীবন সংগ্রামের কথা লিখিত হওয়ায় আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। আবার আমলা সুহাস ও জোতদার গয়ানাথের জমি জরিপ, বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিনীতি, উন্নয়ন, ব্যারেজ নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যাত্রাণ, কৃষক-শ্রমিক বিবাদ, সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, এম, এল, এ কৃষক নেতা, দলীয় কর্মীদের রাজনৈতিক সভা ব্যারেজ উদ্বোধন; নির্বাচন সামনে রেখে উদ্বোধনে

মহা মিছিল করে ক্ষমতা প্রদর্শন এবং উত্তরখন্ডের ব্যারেজ বিরোধী তথা উন্নয়ন বিরোধী শক্তিকে প্রর্যুদস্ত করা উদ্বোধন উপলক্ষে কত মন্ত্রী আমলার সমাবেশ, সব শেষে মাদারির মা, বাঘারু-মাদারিদের এসব তথাকথিত উন্নয়নকে প্রত্যাখান করা ইত্যাদি ঘটনা তো রাজনৈতিক উপন্যাসেরই লক্ষণ। দেশ বিভাগের পরিণতিতে ওপার বাংলার উদ্বাস্তু, বিশেষত নম:শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষিজীবী মানুষদের এপারে আসা, তিস্তার চরের জমি বেছে নিয়ে বন্যার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার কাহিনি অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এ পারে এসে এখানকার রাজবংশীদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে মাঝে মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ, অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। আবার এরাই চরুয়া হয়ে পঞ্চায়েতে অংশ নিয়েছে; এখানকার নাগরিক হয়ে উঠেছে। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা উপন্যাসখানির ঐতিহাসিক লক্ষণ চিহ্নিত করে।

বন-পাহাড়-নদীর কাহিনী, তিস্তা বুড়ি, 'কমলে কামিনী'র মিথ উপন্যাস খানিতে কেমন যেন রোমান্সের গন্ধ বয়ে আনে।

মিছিল পর্বের রাজবংশী সমাজের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রাজবংশের রাজকীয় কাহিনি। রাজ্যলাভ, রাজ্যহারানো, ভারতভুক্তি, রাজবংশীদের হৃত গৌরব উদ্ধারের আন্দোলন, স্বভূমি ফিরে পাওয়ার জন্য উত্তরখন্ড দল গঠন ইত্যাদি যেন মহাভারত, রামায়ণের কাহিনি। পঞ্চানন মল্লিক বীরেন বসুনিয়াদের সঙ্গে সম্পৎ রায়, গয়ানাথ, বাঘারু, আসিন্দির যোগ দেওয়ায় এতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। এবং উপন্যাস খানির মহাকাব্যিক মহিমা প্রকট হয়েছে। সুতরাং এত লক্ষণ যুক্ত তিস্তাপারের বৃত্তান্তকে কোনো বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করা খুবই মুশকিল। তবু একথা স্বীকার করতেই হয় যে উপন্যাসখানিতে মহাকাব্যিক লক্ষণই সবচেয়ে বেশি পরিস্ফূট। মহাকাব্যের বিশাল বিস্তারে অন্য সব লক্ষণ যেন একাকার হয়ে যায়। এবং দেবেশ রায়ের উপন্যাসের ধারায় তথা বাংলা উপন্যাসের ধারায় আর একটি মহাকাবিক উপন্যাস সংযুক্ত হয়েছে।

তিস্তাপুরাণের স্বরূপ বিচার

তিস্তাপুরাণের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে এর বিষয়বস্তুর চারটি স্তর চোখে পড়ে। প্রথম স্তর পৌরাণিক আবহ। নামকরণ, প্রচ্ছদচিত্র, রাজবংশী প্রবাদ, উৎসর্গ, বংশ তালিকা, প্রতি পর্বের শেষে পুরাণ পরিচিতিমূলক কথা, উপন্যাস জুড়ে নানা তত্ত্বকথা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপন্যাসখানিকে পুরাণ করে তোলার পরিবেশ রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর লৌকিক, বাস্তব। বুড়িমা গোত্রনারী। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের অখ্যাত গ্রাম দলগাঁও-এ বুড়িমার গোত বা বংশ। বুড়িমাই সেই পুরাণ কন্যা যার বংশের কথা উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় স্তর বুড়িমার গোতের আড়ালে আসলে রাজবংশী সমাজের কথা। তাদের দৈনন্দিন, জন্ম, মৃত্যু, আচার-বিশ্বাস, পূজাপার্বন, রীতিনীতি, জীবনযাত্রা প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ স্তর সমগ্র উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা ও কথার সূত্র ধরে রাজনীতি ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়।

'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসখানির এই নামকরণের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা হয়েছে এটি একটি পুরাণ। '"বঙ্গীয় শব্দ কোষ' এ পুরাণ কথাটির বাচ্যার্থ করা হয়েছে 'পুরাতন'। 'পুরাণ বিন [পুরাভবম ইতি পুরান + তন (ষ্টান), নিপাতনে 'ত' লোপ, নত্ব (অ: টী:), সং পুরাতন > প্রা পুরাঅন > °ন (?)]"৪৯ (বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্বিতীয় খণ্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাডেমি ১৯৬৬, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, পৃঃ ১৩৪৫) এছাড়া পুরাণ শব্দটির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, গুণরাজখান, মালাধর বসু বিরচিত' গ্রন্থের ভূমিকাংশে।

"পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। পুরাকালে প্রাচীন কাহিনীর এক বিশেষ গ্রন্থের নাম ছিল পুরাণ। বেদাদি গ্রন্থে এর উৎপত্তির কথা আছে। অথর্ববেদে, শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে, আপস্তম্ব বা গৌতমের ধর্মসূত্রে এবং মহাভারতে ও মনুসংহিতায় পুরাণ প্রসঙ্গ রয়েছে। পুরাণ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল 'পুরাকালীন', ইতিহাস শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ 'এই রূপ ছিল' পুরাভবম ইতি পুরাণম আর ইতি-হ-আস হল ইতিহাস। মূলতঃ পুরাণ বলতে বেদোত্তর যুগের ইতিহাস আখ্যায়িকা উপকথা ও ধর্মমূলক এক শ্রেণীর বিশিষ্ট গ্রন্থকে বোঝায়।

পুরাণের প্রধান লক্ষণ পাঁচটি এক, সর্গ (সৃষ্টি), দুই, প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নব সৃষ্টি), তিন, বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশবর্ণনা), চার, মন্বন্তর চৌদ্দজন মনুর শাসন বিবরণ) এবং পাঁচ, বংশানুচরিত (পৌরাণিক রাজগণের আখ্যায়িকা)"৫০

পুরাণ তো মহাকাব্য । তাই তিস্তাপুরাণ-এ মহাকাব্যের নানা বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

তিস্তাপুরাণের প্রচ্ছদে এবং তিস্তাপুরাণের শিরোনাম জ্ঞাপক ভেতরের পৃষ্ঠায় নদীতে হাত ধরাধরি করে

বুড়িমার গোত

নানা ঘটনায় নানা মানুষজনের ও তাদের ভিতরের সম্পর্কের কথা ঘুরে-ঘুরে এসেছে। এদের পরিচয় খানিকটা ছকে দেয়া হল—কারো-কারো বেলায় আনুমানিক জন্মবছর, এমনকী বিয়ের বছরও। এ সবই নিছক বানানো।

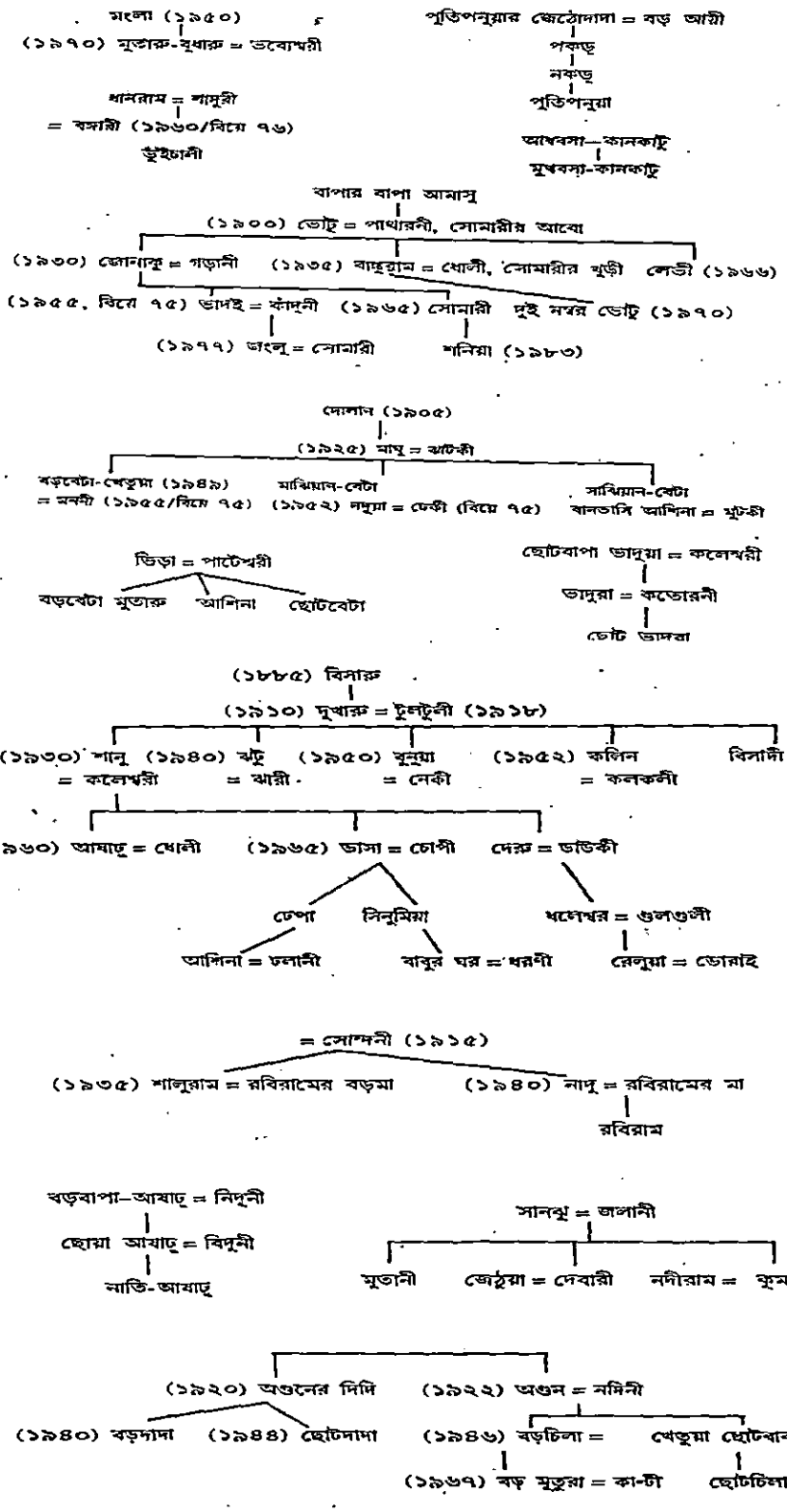

বৃত্তাকারে জলক্রীড়ারত নারী পুরুষের দুটি ছবি আছে। পুরাণের সময় ঘুর্ণায়মান। এর শুরু ও শেষের হিসেব নেই। যেখানে শুরু আসলে সেখানে কোনো কিছুর শেষও বটে। শেষ না হলে শুরুই বা হবে কেমন করে, বা অন্য কোন শেষও শুরু হতে পারে সেখান থেকে। এমনই এক সময়ের এলোমেলো হিসেব বুড়িমার গোতের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পুরাণের মতো বুড়িমার গোতেরও পরিচয় জ্ঞাপক একটা বংশ তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সূচিপত্রের পরের পাতায়। সেখানে লেখক লিখেছেন —" নানা ঘটনায় নানা মানুষজনের ও তাদের ভিতরের সম্পর্কের কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে। এদের পরিচয়ের খানিকটা ছকে দেয়া হল — কারো কারো বেলায় আনুমানিক জন্ম বছর, এমনকি বিয়ের বছরও। এ সবই নিছক বানানো।"

ভূমিকা অংশে দেবেশ রায় লিখেছেন—".....নদীমানুষের একই ভুবনে যে এমন ঘুরছি সে হয়তো বেরিয়ে আসার পথ জানিনা বলে। বা, হয়তো বেরিয়ে আসার পথ চাই না বলেও। বা হয়তো বেরনোর পথ নেই বলেই।" লেখকের এই বক্তব্যের সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘুর্ণায়মান ছবিটির মিল দেখতে পাওয়া যায়। সময়ের বাইরে যাবার সাধ্য কার। বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে গিয়ে আবার সেই বৃত্তে ফিরে আসা ছাড়া উপায় কী? এমন দার্শনিকতার আশ্রয় করেই বুড়িমার গল্প সাজানো হয়েছে। উৎসর্গ অংশের রাজবংশী প্রবাদ 'দিন যায়, কথারয়', সেই অর্থ বহন করে। আবার কন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী তীর্ণাকে উদ্দেশ্য করে লেখকের উক্তি 'একদিন তোকে এ গল্পের পাকে পড়তেই হবে।' শুধু তীর্ণা কেন জগতের কারোরই এই গল্পের পাক থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।

লক্ষ করা যায় উপন্যাসটির একেকটি পর্ব সমাপ্ত হয়েছে কোন পৌরাণিক ঘটনার স্মৃতিমণ্ডিত কথা দিয়ে। এমনকি কোন কোন পর্বের শেষে এপিসোডের নামকরণও 'পুরাণকন্যা', 'পুরাণপুরুষ' এরকম রাখা হয়েছে।

প্রথম পর্ব 'শেষ' এর পংক্তি দুটি— 'সে মাটিতে গোহি, হলরেখা, এখনো মিশে যায়নি। সে হলরেখা থেকে এই বানা জাগা প্রহরে সেই পুরাণকন্যা উঠে আসতে পারে।' সে হলরেখা থেকে উঠে আসা পুরাণকন্যা সীতা ছাড়া কে? এখানে এক কৃষি নির্ভর রাজবংশী সমাজের কথা সে বর্ণিত হয়েছে। তার প্রধান চরিত্র বুড়িমা সীতার সঙ্গে উপমেয়।

দ্বিতীয় পর্ব 'আর একশেষ' এর শেষ অধ্যায় 'পরজন্ম থেকে', তার আগের অধ্যায় 'পুরাণ পুরুষ'। 'পুরাণ পুরুষ'এর শেষ দুটি পঙক্তি-'লগিটা সোলংগার ভিতরে ফেলে দিয়ে দুই হাতে দুই বৈঠা দুদিকে নামিয়ে তিস্তার অন্ধঝর স্রোতকে প্রতিহত করতে সেই শেষ কৈশোরের ঘাটোয়াল শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলে 'মোক তো

নদীখান খুঁজিবারই লাগিবে।' যেমন নদী খুঁজতে বেড়িয়েছিল কোন এক কালে কোন এক পুরাণ পুরুষ।'

এই পুরাণ পুরুষ তো ভগীরথ। যিনি স্বর্গ থেকে মর্তে গঙ্গা আনয়ন করে সেই গঙ্গার পূত পবিত্র জলের স্পর্শে সগর বংশের ষাট হাজার মৃত সন্তানের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। ঘাটোয়ালও সেই রকম ভগীরথ যে নদী চিনতে বেরিয়েছে— তিস্তার জলে, দশনদী, বিশনদীর জলে মৃত প্রায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে। এ জন্মে না হলেও পর জন্মে।

তৃতীয় পর্ব 'আরম্ভ'। পুরোপুরি রাজনৈতিক পর্ব পুরাণে যেমন থাকে। এর শেষ অধ্যায় 'লেভি'র শেষ পঙক্তি—'এরা এদের দৈনন্দিন এক পুরাণ থেকে যে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই পৌরাণিক দৈনন্দিনে আবার প্রবেশ করে'।

'আছে, আছে, আছে।'

এখানে বুড়িমার গোতের দৈনন্দিনকে পৌরাণিক দৈনন্দিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে গোত্র প্রধানা বুড়িমা অবশ্যই বেঁচে আছেন —'আছে, আছে, আছে।'

চতুর্থ পর্ব - 'আরম্ভের পর' এর শেষ লাইন 'এমন নির্বাসন পুরাণ পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে'। রামায়ণে রাজ্যাভিষেকের মুখে রামচন্দ্রের নির্বাসন। মহাভারতে যুদ্ধজয়ের পর যুধিষ্ঠিরাদির স্বেচ্ছা নির্বাসনের কাহিনি আছে। এখানে ছোটদাদাও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ব্যর্থ হয়ে নির্বাসিত হয়েছে।

পঞ্চম পর্ব - 'আর এক আরম্ভ' এর শেষ লাইন - 'ঢেমনার মুখে বড়দাদা আগুন ছোঁয়াবার আগেই বুড়িমার গোতের তিন গোত্রধর এই পৃথিবীর সেই স্থানটিতে পৌঁছয়, যে স্থানটি ঢেমনার ক্ষেত' বলে নামাঙ্কিত হয়ে গেছে— পুরাণে যেমন গোত্র ও দেশ এক একজন পুরাণ পুরুষকে ধরে আবর্তিত হয়।' এখানেও পুরাণ পুরুষের নামে নামাঙ্কিত দেশটি ভারত, বংশ পুরুবংশ, এবং পুরাণ পুরুষটির নাম ভরত।

ষষ্ঠপর্ব - 'শেষান্তর' এর শেষ পঙক্তি '..... পুরাণে যেমন অনেক অনেক যুদ্ধ, জয়পরাজয় ও জন্মমৃত্যুর পর একখান গোত বহুখান হয়ে বহু দিকে চলে যায়।' মহাভারতের পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করে। কিন্তু রেখে যায় তাদের বংশধরদের।

সপ্তম পর্ব - 'কথান্তর' এর শেষ পৃষ্ঠায় বুড়িমার বিসর্জন—'মোক নিগি যা পিঠত বুকুনি বান্ধি। তিস্তার জলত মোর বিসর্জন দে। মোক তিস্তাত ভাসি দে।' ছোটদাদা এ বিসর্জনের কাজ করে। সঙ্গে কুকুর ভেউলা। 'পশুর টের পাওয়ার শক্তিতে পুরাণ শেষ হল। বুড়িমার গন্ধ চলে যাচ্ছে একদিকে বুড়িমার গোত

পড়ে আছে উল্টোদিকে।' যেন সীতার পাতাল প্রবেশ - উল্টো দিকে পড়ে থাকলো তার গোতবংশ।

সাতটি পর্বের সাতটি পৌরাণিক ঘটনার আবহ ছাড়াও উপন্যাসে আরও তিনটি বড় অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। এক- বানা ঝোলা, দুই- নদী খোঁজা, তিন- তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়া। উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "যে বানা খান পাহাড়ঠে ঝুলিবার দেখিছুঁ ঐ বানাখান তো নামিবে। যে সোলংগা খান তিস্তাত্ নদী খুঁজিবার দেখিছুঁ ঐখান তো ফিরিবে। যে হাতিখান তিস্তার চরত ডুবিবার দেখিছুঁ ঐখান তো পাতালঠে পাখামেলি কোনোদিন উড়িবে।"৫১

তিস্তাপুরাণ এই পৌরাণিক কাঠামোর ভেতর এক আধুনিক পুরাণ। বুড়িমা গোত্র নারী। তাঁকে কেন্দ্র করে দশনদী-বিশনদীর পৃথিবীতে বুড়িমার গোত ও জোত। সেই গোত ও জোত আসলে অন্য কোথাও নয়, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত দলগাঁও সরুগাঁও গ্রাম। "কে না জানে আংরাভাসা আর গোলুন্দি এই দুই নদীর মাঝখানে একটা ঝারে কয়েকটা টাড়ি আছে? তার পুবে দুদুয়া আর কুলজুয়া এই নদীর মাঝখানের একটা ঝারে কয়েকটা টাড়ি আছে? তার পূবে-উত্তরে ডুবুরি বন্দরহাট আর দক্ষিণে শিসতলির হাট এই হাটের মাঝখানে দলগাঁও সরুগাও। .....সেই দলগাঁও - সরুগাঁও থেকে খানিকটা পূবে গেলে বুড়িমার গাঁও।"৫২

এ পুরাণ আসলে এক ইতিহাস। যে ইতিহাসের স্থান, তিস্তাপারে বড়বাঁক, আংরাভাসা, গোলুন্দি, নোমাই, গরাতি, দুদুয়া, কুলজুয়া, জলঢাকা, ইত্যাদি ছোটবড় নদীবেষ্টিত অঞ্চল এবং আরও দূরে হিলির দুই-তিন মাইল ভেতরে নীলফামারি ও পূর্বে তোর্সার পারে পুণ্ডিবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত।

কালের দীর্ঘতা বোঝানো হয়েছে এভাবে—"একখানা শালগাছ পাকা হতে লাগে অন্তত আটটা মানুষের জীবন। তার মধ্যে অন্তত চারখান মানুষের জীবনের আগে, বুড়িমা বৌ হয়ে আসারও অনেক অনেক আগে মরাঘাট পরগনার - প্রথম সেটলমেন্টে বুড়িমার গোত তৈরি হয়ে আসছে।" ৫৩

উপন্যাসের ঘটনা কাল ১৯৬৪,৬৫,৬৬- খরার আগের ও ৬৭,৬৯ -র ভোটের পরের সময়। বুড়িমা তাঁর বানা ঝোলা ঘোষণা করেন লেভি-খাশ-ভোটের ঘটনার তিরিশ বছর পর, যে কথা সোমারী, ক্ষেতবাড়ির সবাইকে চেচিয়ে বলবে—"বড় বানা ঝুলি আছে-এ বুড়িমা কহি দিছে-এ-এ।" ৫৪

আর বিষয়—বুড়িমার গোত ও জোতের কথা। "বুড়িমার গোতের জোত তো পাকুর গাছের মত। তা থেকে কত ঝুড়ি নেমেছে। কত শিকড় গজিয়েছে, কত শিকড়ের শিকড় কত দিকে ছড়িয়েছে।"৫৫ সেই

গোতের নরনারী তাদের জন্ম মৃত্যু বেড়েওঠা, বিবাহ, আচার অনুষ্ঠান, খাওয়া-পরা-ভাষা ভাবভঙ্গি-আদবকায়দা, বাড়িঘর-এগিনা, রাজনীতি, সামাজিকতা ইত্যাদির বিশিষ্টতা। এছাড়া এদের সঙ্গে সম্পর্কিত পূর্ববঙ্গের ভাটিয়া, চা বাগানের-মদেশিয়া, কুলি মজুর, বিডিও অফিস, হাটবাজারের মানুষজনেরও নানা কথা।

বুড়িমার গোত সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর রাজবংশী জনসমাজের একটি অংশ। একান্নবর্তী পরিবার। পরিবারে শুধু রক্তসম্বন্ধে বা বৈবাহিক সূত্রে নারী পুরুষরাই বসবাস করে না—এখানে আছে ঢেমনা, ছোটদাদার মত আপাত সম্পর্কহীন মানুষেরাও আর আত্মীয়স্বজন। টাড়ি বাড়ির বহু লোকের নিত্য যাওয়া আসা।

বুড়িমার গোতের এত মানুষজন, তার বিশাল বিস্তৃত জোতে কৃষিকাজ ও দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে কী ভাবে নিজেদের নিযুক্ত রেখেছে, কী ভাবে ধীরে ধীরে নানা ঘটনা ও পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়েছে—তারই কাহিনি এক ঘটনার সূত্রে আর এক ঘটনা, এক কথার সূত্রে হাজার কথা, একই কথা অনুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট, গোটা রাজবংশী সমাজের জীবনালেখ্য। ব্যষ্টির ইতিহাস হয়ে উঠেছে সমষ্টির ইতিহাস।

বুড়িমার জোতের ও গোতের লোকজন ঃ

বুড়িমার গোতে রক্তের সম্পর্কের ও নানা ভাবে যুক্ত মানুষজনের একটি তালিকা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওরা এবং আরও কিছু লোকজনের পারস্পারিক সম্পর্কের আর একটি তালিকাও সংযোযিত হল —

শাদুরী - ধানরামের বৌ, নদিনী - অগুনের বৌ, বড় চিলার মা, কাল্টি- বড় চিলার বৌ, বড় মুতুরা - বড় চিলার ছেলে, ছোটদাদা - ঢেমনার বেটা, ধাপগঞ্জের পিসির ছেলে, টুলটুলি - দুখারুর বৌ, সোন্দনী - দোলানের বৌ, সোমারী - জোনাকুর মেয়ে, জোনাকু - বাঙ্কুরামের বড় দাদা, পাথারনীর মেয়ে (লেভির সময় জন্ম), শনিয়া - সোমারীর মেয়ে, ভোটু—জোনাকু-বাঙ্কুরামের বাবা, কলকলি- কলিনের বৌ, নেকী - বুনুয়ার বৌ, ধোলী - বাঙ্কুরামের বৌ, ঝটু—দুখারু-টুলটুলির ছেলে, বৌ সোমারী - জোংলুর বৌ, কলেশ্বরী - ভাদুরা ছোটবাপার বৌ, কতোরানী - ছেলে ভাদুরার বৌ, খেতুয়া—মাঘুর ব্যাটা, আর এক খেতুয়া - ছোটবাপা-মাটকীর ছেলে, মননী - খেতুয়ার বৌ (এবাড়ির এখনও পর্যন্ত ছোট বৌ, বাপের বাড়ি পুন্ডিবাড়ি) মংলা - মুতারু-বুধারুর বাপ, আমাসু-জোনাকু-বাঙ্কুরামের বাপের বাপা। ভাসা - সানঝুর মাইঝন বেটা, দেবু-ডাউকির স্বামী, ধলেশ্বর - ডাউকির ছেলে, গুলগুলি - ধলেশ্বরের বৌ, ঢেকী - মাঘুর মাইঝন বেটা নদুয়ার বৌ, কাদুনী -

ভাদইয়ের বৌ, ঢেপা - সিমুনিয়া—ভাসা ও চোপীর দুই ছেলে। ২ নং ভোটু - বাঙ্কুরামের ছেলে, আশিনা - ঢেপার ছেলে, বাবুর ঘর, সিমুনিয়ার ছেলে, শানু - দুখারুর ছেলে, মুতারু, বুধারুর বৌ - ভব্যেশ্বরী। শাদুরী - আত্রেয়ীর পারের মেয়ে, আষাঢু - কলকলির বড় ভাসুরের বেটা, বিদুনি - ছোয়া আষাঢুর বৌ।

এ ধরনের নাম বাংলা-সংস্কৃত নামের অনুরূপ নয়। রাজবংশী সমাজের এই বিশেষ ধরনটির কারণ ও বর্ণনা করা হয়েছে উপন্যাসে।

" বৈশাখ মাসে যে জন্মায় তার নাম বৈশাখু, আষাঢ় মাসে যে জন্মেছে তার নাম আষাঢু বা আষাঢ়ী, চৈত্রমাসে যে জন্মে তার নাম চৈতা, বুধবার যে জন্মেছে তার নাম বুধারী, খুব ঝড়-জলের রাতে যে মেয়ে জন্মেছে তার নাম আনধারনী। মাস তো মোটে বারোটা। দিন তো মোটে সাতটা। বুড়িমার এই সংসার তো তার চাইতে অনেক বড়। এতই বড় যে বড়-বুধারী আর ছোট বুধারী বা কালা-চৈতা আর ধলা-চৈতা এখন সব পার্থক্য করে করেও এক নামে আর ক'জনকে আঁটানো যায়। যার নাম সেও তো শেয়ানা হয়। বিয়ে করে, সে-মেয়েও তো বিয়াত্তী হয়। তখন সেই বৈশাখু বা আষাঢু ঘরের ছাওয়া-ছোটও তো বৈশাখ বা আষাঢ় মাসে, চৈত্রে বা ভাদ্রে, বুধবারে বা সোমবারে, ঝড়জলের অন্ধকার রাতে বা জ্যোৎস্নায় জন্মেছে। তখন তো আর তাদেরও বৈশাখু বা আষাঢু বা ভাদই বা চৈতা, বুধারী বা সোমারী, আনধারনী বা পুনিয়া এইসব নামে ডাকতে হয়। বড় জোর তার সঙ্গে যোগ হয়, আষাঢুর ঘরের বুধারি বা ভাদই এর ঘরের পুনিয়া। এমন কত আর আলাদা করা যায়? খুব বেশী হলে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, খুব সকালের দিকে জন্মেছে বলে পোহাতী বা রবিবারে জন্মেছে বলে দেবারু বা অগ্রানে জন্মেছে বলে অগা, বা কোন কুটুম বাড়িতে জন্মেছে বলে সোদোরু। তারও তো শেষ আছে। তারাও তো সেয়ানা গাবুর হয়েছে। তারাও তো বিয়ে বসেছে। মেয়ে হলে যে বাড়িতে বৌ হয়ে গেল সে বাড়িতেও তো এই বৈশাখু, আষাঢু, দেবারু, সোমারু, পোহাতী আছে। তাদের যখন ছাওয়া ছোট হতে শুরু করবে তখন তো আর সেই বৈশাখু, চিলা, বগী, সোদর এই সব নামের মধ্যে তারাও ঢুকে যাবে। অতিরিক্ত হয়তো এই টুকু যোগ হয় — পায়খানা করতে গিয়ে পেট থেকে বেরিয়ে গেছে দেখে, জংলু বা জন্মের অনেকক্ষণ পর প্রথম পেচ্ছাব করেছিল বলে, বাসিয়া। তখনো এসব বলা হয় ছোট জংলুর বড় অগী, বা বড় চিলার ছোট পুনিয়া। তবে এই বড় আর ছোট দিয়ে কত ভাগ করা যায়? একটাই রক্ষা ছাওয়া ছোটরা যত মাথা চাড়া দেয়, যত শেয়ানা হয়, যত গাবুর হয়, ততই তার নাম ছাড়িয়ে ওঠে। কেউ হয়ে যায় বড় বহিন, পুনিয়ার ঘরের বড় বহিন, বা ছোট বুধারুর ঘরের বড় বহিন। কেউ হয়ে যায় মোটা। কেউ ছোট

বাপা, কেউ বড় মাইঝিলা, কেউ খুড়াবাপা, কেউ বড় বাপা, কেউ খুড়ী, কেউ আপা, কেউ আয়ী। এমন বড় হয়ে গেলে নামটা তখন ছাওয়া ছোটর ঘর ছাড়িয়েও যেতে পারে।" ৫৬

রাজবংশী বাড়ির আদল ও জীবনযাপন

এ রকম নাম বিশিষ্ট রাজবংশী সমাজের বাড়ির আদল, বসবাসের নিজস্ব ভঙ্গিও আছে। "একখান বড় জোতদারের বাড়ি, বা খুব বড় বড় জোতদারের বাড়ি, শাল খুঁটির ওপর দেড়তলা হতে পারে, টিনের চাল হতে পারে, কাঠের বেড়াও থাকতে পারে। বাড়ির নকশাটা তাতে বদলে যাবে না। চারদিক খোলা বলেই পুবে বাহির এগিনার উত্তরে দেওঘর, তার আগে কুয়ো-কাঁচা অথবা পাকা, আর পাট শুকতে দেওয়ার বাঁশ। দারি ঘরের তো দু'দিকেই দরজা। দারিঘর আর গোলা ঘরের মাঝখানে ছোট এগিনা গোলাঘরের দুদিকে দরজা। গোলাবাড়ি যে ভিতর এগিনার পশ্চিমমুখো পুব ভিটেয়, সেই এগিনারই দক্ষিণ মুখো উত্তর ভিটেয় বাস্তুঘর আর দুটো বা একটা শোয়ার ঘর সেই এগিনারই পুব মুখো পশ্চিম ভিটেয় আরো শোয়ার ঘর। সেই এগিনার উত্তর মুখো দক্ষিণ ভিটেয় খড়ি ঘর- রান্না ঘর থাকার কথা, বৃষ্টি হলে যে ঘরে রান্না হয়, আর বাইরে দুটো বড় বড় উনুন, বৃষ্টি না থাকলে যেখানে রান্না হয়।" ৫৭

রাজবংশী বাড়ি সম্পর্কে প্রচলিত ছিলকা এরকম —

'উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ধুয়া
পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।'

অর্থাৎ বাড়ির উত্তর দিকে সুপুরি বাগান, দক্ষিণ দিক ফাঁকা, পূর্বদিকে পুকুর এবং পশ্চিম দিকে বাঁশ বাগান।

বিশেষ আদল যুক্ত রাজবংশী বাড়ির আরও বিশেষত্ব হলো তার এগিনা। ভেতর, বাহির, নতুন, খন্দক, বরহ, পাছত নানা নামে পাঁচটি ছটি, এগিনা যুক্ত বড় জোতদারের বাড়ি দেখা যায়। আট-দশ বিঘা জমির ওপর - পাঁচ-ছ'টি এগিনার বিশেষ আদলের বাড়ি, বুড়িমার বাড়ি। গাছপালা, এগিনা, আর বহুঘর দরজার বাড়িতেই বুড়িমার গোত অবস্থিত। বাড়ির সঙ্গে উঠোন বা এগিনা বাড়ির একটি অচ্ছেদ্য অংশ। এগিনা বহু রকমের, এর ব্যবহার বহু ধরনের। রাজবংশী সমাজে বাড়ির সঙ্গে এগিনা বা উঠোনের গুরুত্ব সমান। অনেক লোকের বসবাস থাকলে এক এগিনায় কুলোয় না। ফলে আরও কয়েকটি এগিনা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় 'বরহবাড়ি'। বুড়িমার বাড়ি সেই রকমই। "বুড়িমার বাড়িতে শোয়ার লোক এত বেড়ে গেছে যে এক এগিনার দুই ভিটের ঘরে কুলোয় না, তাই রান্নাঘর, খড়িঘর, আর উনুনও ভিতর এগিনার দক্ষিণ ভিটেয়

নেই। সেখানে কলোবাড়ি, আমরাড়ি, খেড়িবাড়ি। ভিতর-এগিনার পেছনে পাছত-এগিনায় উত্তর ভিটেয় দুটো শোয়ার ঘর আর পশ্চিম ভিটেয় দুটো শোয়ার ঘর। এই পাছত এগিনাতেই দক্ষিণ ভিটেয় খড়ি ঘর, রান্নাঘর আর বাইরের উনুন। এই পাছত এগিনাতেও তো কুলোয় না, বুড়িমার বাড়িতে শোয়ার লোকজন এতই বেড়ে যায়। তাই পাছত এগিনার পেছনে নতুন এগিনা তৈরি হয়। সেখানেও উত্তর ভিটেও দক্ষিণ মুখো আর পশ্চিম ভিটে পুব মুখো চার চারটে শোয়ার ঘর আর দক্ষিণ দিকে খেড়ি বাড়ি। পাছত এগিনা আর নতুন এগিনার মাঝখানে একপাশে কাঁচা কুয়ো। তাতেও যখন কুলোয় না, তখন পাছত এগিনার পেছনে এক এগিনার দুই ভিটেয় চারটে শোয়ার ঘর তৈরি হয়। বাড়ি যদি পেছন দিকে বাড়তেই থাকে তাহলে জঙ্গল বাড়ি তো শোয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকবেই। জঙ্গল বাড়ি না-হয় কেটেকুটে পুড়িয়ে এগিনা বানানো যায়। এ যে আস্ত একটা ফরেস্ট। সেই বহর গাছটাকে দক্ষিণের ভিটেয় ফেলতে এই বহর এগিনাটা ডানদিকে কেতরে গেছে। তেমন কেতরানোর ফলে তো দিকও বদলে গেল। পশ্চিম মুখো বা উত্তরমুখো ঘরে তো আর কেউ শুতে পারে না। কেতরে যাওয়া এগিনায় পুবমুখো আর দক্ষিণমুখো শোয়ার ঘর দুটো ভিটেকে কেমন কোনাচে চেহারা দিয়েছে। সেই বহর গাছের ধাক্কাতেই বহর এগিনারও পেছনে যে খন্দক এগিনা তৈরি হল — তাও ডানদিকে আরও কেতরে গেল আর এগিনার মাঝখান দিয়ে ফরেস্টের পুরোনো বাতিল নালী চলে গেছে।" ৫৮ নালী যাওয়ার ফলে বর্ষাকালে জায়গাটা পিছল হয় তাই ওটার নাম মুখে মুখে পাছল এগিনা হয়ে গেছে। ঘর এগিনা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। ঘর না হলে এগিনা হয় না। তাই এগিনার জন্য ঘর তৈরি আবশ্যক। ঘরে থাকার মত আছেই বা কী। শোয়ার জন্য তো এগিনাই ভালো। এছাড়া এগিনায় ধান শুকোবে, পান শুকোবে গরু-বলদ একটু-আধটু ঘুরবে, কুকুরটা ছোটাছুটি করবে, তবে তো সেটা এগিনা। একটা মানুষের গোড়ালি থেকে চুল পর্যন্ত খোদিত হয়ে যাবে এমন একটা লম্বা চওড়া ঘর-ঘেরা, কলোবাড়ি, আমবাড়ি, গুয়াবাড়ি, ঘেরা জায়গা না হলে সেটা এগিনা হবে কি করে? এগিনায় ঘোরাফেরা করে কাজকর্ম করে যে নারীপুরুষ, তাদের দেহভঙ্গি ফুটে ওঠে এই এগিনারই প্রেক্ষাপটে। মাঠ থেকে পুরুষটি যখন এগিনায় ঢোকে "তার সারা শরীরে পেশি গুলো কেমন নেচে ওঠে, তার নেংটি পরা শরীরের পেশিগুলো। বা নারীটি যখন এগিনায় দাঁড়ায় বা এগিনা পার হয় তার শরীরের আশির নখ লাবণ্য উছলে ওঠে, আর ফোতার ওপর থেকে তার নিরাবরণ ঊর্দ্ধবুক, কাঁধ, গলার কম্বুরেখা, বাহুসন্ধির হাড়ের সজীবতা ঘাড়ের দৃঢ়তা, মেরু রেখার অবনয়ন আর ফোতার নীচে তার কর্মঠ পায়ের চারুতা তার পদক্ষেপ, এসবই আকার পায়, ভেঙে যায়, আবার নতুন আকারে জেগে ওঠে।" ৫৯

ঝুলে থাকা বানা যে কোন মুহূর্তে নামতে পারে ভেবে গোতের লোকজনের গোহালিয়া ঘররক্ষা, পাটাঘর রক্ষা ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত থাকাকালীন পরিশ্রমী ছোট বাপার ঘামঝরা শরীরের বর্ণনাও গোটা কৃষিজীবি রাজবংশী সমাজের শ্রমক্লান্ত জীবনের ছবি।

"ছোটবাপা ঘামছিল দর দর করে। সে ছুটছিল আর তার মেরুদণ্ডের খাত দিয়ে জল বইছিল ঘাড়ের মধ্যবিন্দু থেকে। তার পিঠের দু'দিকের ওপরের পেশি থেকে ঘামের স্রোত সেই মেরুদণ্ডের খাতে এসে পড়ছিল, তার পাছার খাতের দু'দিকের পুষ্ট অথচ পৌঢ়ত্বে শিথিল পেশি ভিজে সপসপ চকচক করছিল আর সেখান থেকে ঘামের ধারা পাছার পেশির নীচের খাঁজ বেয়ে উরুর ভিতরে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। তার উরুর পেশিও পৌঢ়ত্বে শিথিল অথচ হাঁটুর ওপরে সেই পেশির খাঁজ স্পষ্ট দৌড়ানোর ফলে সেই খাঁজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই পেশির চাঞ্চল্যের দ্রুততায় ঐ শরীরের, ঐ শ্রম পুষ্ট শরীরের ভিতরে তাপ ঠিকরে বেরচ্ছে। ....প্রায় নির্লোম শরীরে পেটের মাঝখানে গর্তের রোমরেখা ঘামে চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে গেছে।"৬০

সংসারে মেয়েদের অন্যতম প্রধান কাজ ধানভোখা, চাল-চিড়ে তৈরি করা। এখানে সে বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।

"শাল গাছের গোটা গুড়ি ওপর থেকে খুঁড়ে, বড় গর্ত বানিয়ে সাম-উরোন বানানো হয়। সেই গর্তের ভিতরে ধান ফেলে শাল গাছের একটা খুঁটি দিয়ে মেরে ধান বের করা হয়। সেই খুঁটির তলায় লোহার একটা আংটার ঘের থাকে, যাতে খুঁটি ফেটে না যায়। দুই পা ফাঁক করে, ফোতার উপরে মুক্ত কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসা দুই হাতে সাম জাপটে ধরে মাথার উপর তোলে মেয়েরা আর উরোনের ভেতর ফেলে। বস্তা বস্তা ধান এই পদ্ধতিতে, চাল বানানো হয়। চিড়েও বানানো হয়—তার জন্য কম উঁচু, কম গর্ত সাম-উরোন আছে।" ৬১ ধানভানার জন্য, চিড়ে কোটার জন্য, রাজবংশী সমাজে সাম-উরোনই ব্যবহার করা হয়। ঢেঁকির চল নেই। সাম উরোন কোন কোন অঞ্চলে সাম-গাইন নামে পরিচিত। এবং সেখানে সাম বলতে যাতে ধান রাখা হয় এবং গাইন বলে যা দিয়ে সামে রাখা ধান ভুখানো হয়। সাম উরোনের ঠিক উল্টো। 'একখান দশমুণ্ডের নাখান উরোনে একসঙ্গে তিনটা সাম আকাশ থেকে খোঁদলে পড়ে - কখনো বাঁ হাতে কখনো ডান হাতে। একটার ফাঁকে আর একটা, আর একটার ফাঁকে আর একটা।'

মেয়েদের ধান ভোখানোর মত পুরুষদের সারা বছরের প্রধান কাজ চাষবাস। এই চাষবাসের দৈনন্দিন ছবি বর্ণিত হয়েছে এভাবে — " শাওনের এই কুড়িদিন বাদ দিলে সারা বছরই তো বেটাছোয়ার ঘর সকাল

হওয়ার আগে মাঠে যায় আর বেলা ঠাকুর মাথার ওপর ওঠার আগে ফিরে এসে গা ধুয়ে খোকসা ভাত খেয়ে আবার ক্ষেতবাড়িতে যায় আর ফিরে আসে বেলা শেষ হওয়ার মুখে। ক্ষেতের আলে বসে চিড়া মুড়ি বা ভাত-জল খাবার রীতি নেই। গা ধোয়া নেই, হাত ধোয়া নেই, খাওয়া হলেই হল। তাই ক্ষেতবাড়ির মানষির জন্যে খোয়া পাঠানোর কোন ধকল নেই সারা বছর।" ৬২ মেয়েদের ধান ভোখানো, ছেলেদের চাষবাসের দৈনন্দিন ছাড়াও ভাত খাওয়া, খাওয়ার ভঙ্গি, হাটে যাওয়া, কেনা বেচা করা, কথাবার্তা, আনন্দ উৎসব, ব্রত পার্বণ, ধর্মীয় সংস্কার, ইত্যাদি অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ধরা পড়েছে।

রাজবংশী সমাজের প্রধান খাদ্য ভাত। দু'বেলা এমনকি তিনবেলাও ভাত খাওয়ার রীতি এ সমাজে দেখা যায়। সারা দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় ভাত খাওয়ার ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে উপভোগ্য। ভাতের গন্ধ, ক্ষুধার তীব্রতা জাগিয়ে তোলে — শুধু তাই নয় সেই গন্ধ জীবনের নানা স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। ভাত খেতে বসে সারা দিনের কাজের সমীক্ষা, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি তৈরি হয়। তাই ভাত খাওয়া নিতান্ত ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যাপার শুধু নয়, সংসারের নানা সমস্যা নানা কর্ম পরিকল্পনার এক আদর্শ ক্ষেত্র।

"সন্ধে বেলার গরম ভাত খাওয়া রোজকার একটা নেশার মত—অন্তত প্রথম কয়েকটা মুঠো, যখন ভাতের ধোঁয়া থালা থেকে উঠে মুখ ঘামায়, তখন ভাতের দানা গুলো আলাদা করে চেনা যায় না আর খাউয়াইয়া যতটা পারে সেই উত্তাপ মুখের বিবর ভরিয়ে গলা দিয়ে শরীরের ভিতরে পাঠিয়ে দিতে চায়। শুধু উ-ম-উ-ম আওয়াজ। সেই প্রথম ক-মুঠোই ভাতের নেশা শরীরে চারিয়ে যায়, সদ্যসিদ্ধ, গরম ফেনে সিক্ত, টগবগে ভাতের নেশা।" ৬৩

"সকলেরই ভাত খাওয়ার ভঙ্গি একই রকম। ছোট একটা পিঁড়ির ওপর নেংটি পড়া পেছন। সেই পিঁড়ির সঙ্গে গোড়ালি লাগিয়ে দুটো হাঁটু খাড়া, সেই দুই খাঁড়া হাঁটুর মধ্যে মাথাটা নেমে এসেছে, দুই পায়ের পাতার মাঝখানে ভাতের থালা। ডান হাতটা হাঁটুর ভিতর দিয়ে থালায় আর বাঁ হাতটা হাঁটুর ওপর ঝোলে। যারা একটু খাটো তারা, মনে হয় থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। যারা একটু খাড়া তারা যেন এটা মেনে নিতে চাইছে না— ভাতের থালার সাথে মুখের দুরত্ব কেন থাকবে। ঘাড়টা দুই হাঁটুর মধ্যে এতই ঢুকে থাকে যে সে আবছায়ায়, বা কখনো একটু অন্ধকারেই, থালা থেকে ভাত তুলে মুখে ঢোকানো হচ্ছে, যে ডান হাতে, সেটাকে মুখ বিবরের সম্প্রসারণ মনে হতে পারে।"৬৪

ভাতের গন্ধের অনুষঙ্গ অনেক অতীত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। নতুন কোন পরিকল্পনা বা পরামর্শের

প্রেরণা হয়।

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর চলাফেরা, কথা বলা, বসা, খাওয়া, হাসা, দৌড়ানো, গল্পকরা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাদের নিজস্বতা লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে লেখক সেই সেই দিক গুলো অতি নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন।

বড় দাদার দৌড়ানোর ভঙ্গিটিও লক্ষ করার মত। "বড়দাদা দৌড়াচ্ছে, ঘামছে, হাঁপাচ্ছে। সে রোগা, লম্বা, গুয়াগাছের নাখান। তার গলাটা একটু বেশি লম্বা আর মাথার চুল একেবারে খুলি ঘেঁষে ছাঁটা। সে যখন দৌড়াচ্ছে, তখন যেন তার শরীরটা হাড়ে হাড়ে ধাক্কা লেগে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে যেতে চায়। সেই ভাঙন ঠেকিয়ে শরীরটা সোজাই আছে ও শরীরটাকে সোজা রাখতে রাখতেই ছোটে।" ৬৫

দৌড়ানোর ভঙ্গির মত হাঁটারও একটা নিজস্ব ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। "তাদের জেঠাদাদার দু'পাশে তারা দু'জন হেঁটে চলে খঞ্জন আর ফড়িঙ্গা। খঞ্জনের বাঁ হাতে লাঠি, তার মাথা ছাড়িয়ে যায়। ফড়িঙ্গাও বাঁ হাতে লাঠিই নিয়েছিল, সেটা জেঠাদাদার ডান পায়ে লেগে যায় দেখে ডান হাতে নিয়েছে। তার লাঠি তার মাথার তুলনায় একটু বেশি লম্বা। দু'জনের পরনেই নেংটি, জেঠাদাদার নেংটি আলগা পত পত করে, তার পাছার গোল দুটো শুকিয়ে গেছে, চামড়াটা খসখসে, নেংটির দড়িটা কোমর থেকে অনেক নীচে নেমে গেছে। খঞ্জন আর ফরিঙ্গার তরুণ পাছার গোল দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, তাদের পা ফেলার ছন্দে। তাদের নেংটি শক্ত করে বাঁধা। তারা গ্রাম দেবতা গারাম-এর দিকে যাচ্ছে।" ৬৬

তাদের হাঁটে যাওয়ারও একটা নিজস্ব ধরন আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুড়িমার গোতের মানুষেরা গুহাপথে ধূপগুড়ি হাটে যাচ্ছে। যাত্রাপথে তাদের পোশাক-আশাক, পদক্ষেপ লক্ষ করার মতো—

"বাঙ্কুরাম আগে আগে যাচ্ছে। সে একটা খাটো ধুতি কাছা টেনে পড়েছে। কাছাটা সরু, তাই ধূতিটা হাঁটুর ওপর উরুর সঙ্গে লেপটে থাকে। গায়ে কিছু নেই, গামছা গলায় ঘের দিয়ে সামনে ফেলা। বাঙ্কুরাম খাটো শক্ত। যে যতটা খাটো তার কাঁধ সে তুলনায় অনেক চওড়া আর পায়ের বাটি দৃঢ়। তার পেছনেই ছোটদাদা। বাঙ্কুরামকে যদি দেখতে হত কে কে আসছে, তাহলে পেছনে তাকিয়েও, সে দেখতে পেত না। ছোটদাদার পেছনে নদিনী-অগুনের বৌ, বড় চিলার মা।"৬৭

নদী পার হওয়ার সময় জলে হেঁটে চলার আর এক রূপ দেখা যায় —

"জল পেরবার জন্যে দুই হাত আর পায়ের আক্ষেপে তারাও নিজেদের শরীরকে এই জলের মতই বহতা করে তোলে। পেশিময় পুরুষ শরীর গুলি আর অসমতল নারী শরীর গুলি জলের সঙ্গে খেলাতেও মাতে ।

কেউ একটু ভেসে যায়, কেউ স্রোতের একটু উল্টোদিকে যায়, কেউ বা স্রোতকে উছলে যেতে দেয় নিজেদের শরীরে। জলও যেন শরীরে পৌরুষ বা নারীত্ব বুঝে পুরুষ বা নারী হয়ে ওঠে। কেউ মাথা ডোবায় না— মাথাতেই তো কাপড় পেঁচানো। দুইহাত যেন সাঁতার কাটে না, পরস্পরের দিকে প্রসারিত হয়ে সমবেত এক নৃত্যের আবর্ত তৈরী করে তোলে। ফোতা আর নেংটি এই মানুষ জনের অনিবার্য পোশাক - তেমন পোশাক ছাড়া এই বনপথ, জলপথ, গিরিপথে শরীর মেলানো যায় না।" ৬৮

বন-নদী-মেঠো পথ অতিক্রমের সময় ওদের কোন আরষ্টতা ছিল না। কিন্তু ধূপগুড়ি হাটে আসার জন্য পাকা রাস্তায় উঠে গাড়ি চলাচল, লোকজনের ভিড়ে ওদের হাঁটার গতি ও ধরন একেবারে পাল্টে যায়।

অমনি এরা আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকে জড়ো হয়ে গেছে। শাদুরী নদিনীর গায়ে হাত রাখছে। নদিনী আলগোছে বড় চিলার হাত ধরে আছে। বড়চিলা দোলানের পিঠে অকারণে হাত রেখেছে। পেছন থেকে ধাক্কা খেলে যেমন সামনের লোকের পিঠে হাত চলে যায়, ধানরাম আর বাঙ্কুরাম পাশাপাশি হাটে, ধানরাম সামনে না তাকিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

রাজবংশী সমাজের দৈনন্দিনে চাষবাস, খাওয়াপরার মতো হাট একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন যে হাট বসে তাতে কৃষি বা অন্যান্য পণ্য কেনাবেচা ছাড়াও গ্রামের মানুষরা সেখানে প্রতিদিনের কাজের এক ঘেয়েমি থেকে বিশ্রাম নেয়। বহু মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা হয়। আত্মীয়স্বজনদের খোঁজখবর নেয়া হয়। রাজনৈতিক দাবি দাওয়া, প্রচার, মিটিং করে প্রয়োজনীয় কথা শোনানো, লেভি, খাজনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে জানাজানি হাটের মধ্যেই হয়। বুড়িমার গোতের লোকজন ধূপগুড়ির হাটে গিয়ে কেনাবেচার সঙ্গে লেভি সমস্যার সমাধান ও পরবর্তী সরকার বদলের প্রেরণা নিয়ে এসেছে।

হাট সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে, "হাটে তো যেতেই হয়-হাটে না গেলে মানুষজনের চলবে কী করে। হাটেই তো সবার সঙ্গে সবার দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়। সবাই সব জায়গার খোঁজ খবর পায়। ..... সেই মন কাঁদার খবর - সেই মেয়ের কাছে পৌঁছবে কী করে যদি হাটে যাওয়া না যায়? "

শুধু বড়রাই যে হাটে যায় তা নয়, মেয়ে বৌ, ছেলে-ছোকরারাও হাটে যায়। " হাটই হচ্ছে চ্যাংড়াদের বড় হওয়ার, শেয়ানা হওয়ার, জোয়ান হওয়ার প্রতিষ্ঠান।" ৬৯

এই হাট সম্পর্কে কত ছিলকা শোনা যায়—' কয় হাটের ছোয়াই, বাপক কয় বেয়াই'- কত গান শোনা যায়

— 'বাপো গেইসে হাট, মাও গেইসে হাট / মাও আনিবে মোলার নাড়ু, বাপ আনিবে খাট/ ঐ খাটত চরি যাম বিন্দাবনের হাট।' কিংবা — "হাটের মধ্যে বাউরিয়ার হাট, ভোটের মধ্যে পাসি/ সেই মতন দেখুঁ দাদা চেংড়ি মাইয়ার হাসি। / চেংড়ি মাইয়ার হাসি রে মোর টিয়া পাখির রাও/ অ্যানং জুড়াচ্ছে দাদা, ঘোর টেনাটার গাও।" ৭০

ঝুলে থাকা বানা আসছে ভেবে সাম-উরোন সামলানোর সময় বাড়ির মেয়েরা হাসাহাসি করে, সে হাসিরও একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে।

"কলকলী শনিয়াকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, হাসিবার ধইচে দেখোকেনে, ঝ্যান বানা আসিবার আগতই শ্বশুরবাড়ি যাবে। 'অতি বিয়াত্তির না হয় বিয়া, অতি ছোয়াত্তির না হয় ছোয়া।' শনিয়া নেকিকে ঠেলা দিয়ে বলে ওঠে, ' মুই হাসো নাইরো, মুই হাসো নাই। এই মোটার ঘরখান হাসিবার ধরিছে।' শনিয়া আরও হেসে নেকীর ঘেমো পিঠে নিজের ঘেমো মুখ লুকানোর ভান করে।" ৭১

ভাদ্র মাসের তারা ভরা আকাশ। বুড়িমাকে নিরাপদ স্থানে ঢুকিয়ে দিয়ে এবার বাড়ির লোকের প্রতীক্ষা বানার জন্য। সবার জানা হয়ে গেছে, সন্ধ্যার মধ্যে যখন বানা এল না তখন সারা রাত জাগতে হবে। সেই একটি প্রতীক্ষার সন্ধ্যা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে বিশ্রামেরও একটি নিজস্ব ভঙ্গি লক্ষ করা যায়।

"খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ভাদুরা গরমে ভাতের গন্ধ কাটে না। বরং এগিনাতে লেগে থাকে। পার কুমলাইয়ের মেয়ে বলে যার নাম কুমালী, তার নাকে নোলক, তার শাশুড়ি জুলনী, একটা ধোকরা পেতেছিল গোলা ঘরের দাওয়ার নীচে। সেই ধোকরায় কুমালীও বসে ছিল। দাওয়ায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে, তার সেই ছড়ানো পায়ে, উরুতে ও নীচ কোলে পাঁচ খানা বাচ্চা শুয়েছিল, যাদের কারোর পরনে নেংটি নেই ও যাদের মধ্যে দু'জন এখনও বুকের দুধ ছাড়েনি। সেই দু'জনের একজন নিজের বুড়ো আঙুল চুষছিল, আর একজন নিজের নীচের ঠোঁট চুষছিল। তাতে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার আওয়াজ উঠছিল। যারা এখনও বুকের দুধ ছাড়েনি তারা নিজেদের মায়ের বুকে পিঠে বুকনিতে ঝুলছিল।" ৭২

এমন অবসন্ন প্রতীক্ষার রাতে স্বাভাবিক ভাবে কুমালীর কৈশোরের স্মৃতি মনে আসে। উত্তর স্রোতা কুমলাইয়ের জলে কুমালীর মা তাকে স্নান করাচ্ছিল। রসাল বুনো কচি জাম্বুরার মত তার স্তন দুটি। 'উতরা কুমলাইয়ের জল/তিস্তা বুড়ির মাটি মিশল/মোর মাই মোক সিনান করিবার ধরে।' এগিনার ভিতরের কোনো একদল কিশোরী আপনমনে খেলতে থাকে ' নোকটুরে নটুয়া...।'

প্রশ্ন করার ভঙ্গি ও উত্তর দেওয়ার ভঙ্গির মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য রাজবংশী সমাজে লক্ষ করা যায়। লেভির খবর নেওয়ার জন্য অগুন একটা প্রশ্ন করে, তার জন্য অনেকক্ষণ ধরে প্রস্তুতি চলে। গরম ভাত খেতে বসে ভাতের পাঁজার ওপর থেকে প্যালকাশাক একবার ডানে একবার বাঁ-য়ে রেখে একদলা ভাত মুখে তোলে। এরই মধ্যে থালায় ফের ভাত পড়ে। এবার গরম ভাত এক মুঠো হাতে তুলে নিতে নিতে থালার দিকে তাকিয়ে অগুন বলে ' কায়ও কুছু শুনেছেন লেভির বাদে?' ' প্রশ্ন করা হয় ও প্রশ্নটা ঝুলে থাকে। খাওয়ার মধ্যে এখনও উত্তর দেওয়ার ফাঁক তৈরী হয়নি। একটু পড়ে দোলান বলে 'লেভির বাদে। বড় চিলাক ছোটু মিয়া কহিছেন ময়নাতলির হাটত' — উত্তরটা সম্পূর্ণ নয়। হয়তো দোলান ওই টুকু জানে। এর মধ্যে বাড়ির ছেলে মেয়েদের হৈচৈ, বৌয়েদের কথাবার্তা নানা প্রসঙ্গ আসে। প্রশ্ন-উত্তর ওভাবেই ঝুলে থাকে।

"অগুন এতক্ষণ পরে ঝোলা কথার খেই ধরে, বড় চিলা গেছিল ময়নাতলির হাটত। উমরাক ডাকি - ছোটুমিয়া পুছিছে, তোমরালার ঘর লেভি দিবেন কি না দিবেন। বড় চিলা হাটত ফিরি কহিলো। তা ছোটু মিয়া তো আনসান কথার মানষি না, উমরায় পুছিল বড় চিলাক। তোমোরাঁ কায় কিছু শুনিছেন লেভির বাদে?"৭৩ — এ থেকে বোঝা যায় বড় চিলা মারফৎ উপরোক্ত কথা টুকুই অগুনের কাছে এসেছে। তাহলে এই কথা অগুন শুরুতেই বলতে পারত, প্রশ্ন করার কি দরকার ছিল। আসলে প্রশ্ন করে নিজের জানাটা জানিয়ে দিতেই চেয়েছে অগুন, অন্যের জানা জানার জন্য নয়। এও একটা রাজবংশী ধরন।

কৃষিই রাজবংশী সমাজের প্রধান জীবিকা হলেও আরও নানা রকম পেশার লোকও দেখা যায়। ঘাটোয়ালের গল্প প্রসঙ্গে সেইসব লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে —

"যেমন কলো বেচা থেকে—সে শুধু কলাই বিক্রি করে। যেমন পান বেচা থাকে—সে শুধু পান বিক্রি করে হাটে হাটে। যেমন শুটকা বেচা থাকে—সে শুধু শুটকি মাছই বেচে হাটে হাটে। যেমন কাপড়িয়া থাকে—সে শুধু কাপড় বিক্রি করে, সব হাটে নয়, যে সব হাটে কাপড় যারা কেনে তারা আসে, সেই সব হাটে। ..... যেমন মরুচ বেচা থাকে সে শুকনো লঙ্কার পাঁজা নিয়ে সেই সব হাটে বা চা বাগানের মদেশিয়ারা বেশি আসে, তারা ঝাল খায় বেশি, এদেশীয়দের মধ্যে এমন বোকা আর কে হবে যে মিষ্টি না খেয়ে ঝাল খাবে। যেমন বাঁশিয়াল থাকে, সে বাঁশি বাজায়। যেমন, গীতাল থাকে যে গান বানায়। যেমন গাছোয়াল থাকে যে গাছে চড়ে, যেমন গুয়ামানষি থাকে যে সুপারি গাছে চড়ে। .....যেমন নারকেলুয়া আছে, যে নারকেল গাছে চড়ে শুকনো ডাল ভেঙে দেয়, পিঁপড়ের বাসা ঝেড়ে দেয় আর নারকেল পেড়ে দেয়, ...যেমন ঢোলুয়া আছে বড়

বড় হাটে ঢোল বাজিয়ে তারা অনেক কিছু বলে। ময়না গুড়ি হাটে একবার এক ভ্যানিসুয়া এসেছিল— সে অন্যের পকেটে রুমাল গুজে পরে সেটা ভ্যানিস করে নিত, দুটো একটা হাটের পর সে ভ্যানিস হয়ে গেল।"

৭৪

নানা রকম ব্রত পার্বণ উদযাপন রাজবংশী জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কৃষি প্রধান রাজবংশী সমাজে গরুকে দেবতা হিসাবেই মান্য করা হয়। কার্তিক সংক্রান্তিতে তাই পালিত হয় গরুচুমানি। "সকাল বেলায় বড়চিলা, ছোটদাদা, কলিন, বুনুয়া— ছেলেরা সকলে মিলে গরু গুলিকে ডোবায় নামায়। জলে গরু গুলো ভেসে চলে, দেখতে দেখতে ডোবাটা গরু বলদে ভরে যায়।" ৭৫

গরুকে স্নান করানো হয়ে গেলে সব গরু গুলোকে লাইন করে রাখা হয়। "মেয়েরা আবার উলু দিয়ে এগিয়ে আসে। দু'একজনের হাতে মাটির থালার ওপরে পান, গুয়া, কাঁচা হলুদ বাটা, তেল সিঁদুর, ধানদুর্বা। ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির বৌরা-মেয়েরা গরুর শিঙে, কপালে, ক্ষুরে এই সব লাগিয়ে দেবে। রাখাল ছাড়া তো আর গরু হয় না। গরুচুমানি মানে রাখোয়ালচুমানি ব্রত। এই ব্রত অনুযায়ী যে যার স্বামীকে রাখাল হিসাবে ঐ সব মাখিয়ে রাখোয়ালচুমানি করে। .....ব্রতের শুরুতে বাড়ির সবচেয়ে বুড়ি বৌ সবচেয়ে বুড়ি গাই বা বলদকে চুমানি দেয়। তারপর বাড়ির সবচেয়ে ছোট রাখোয়াল, সে যদি কোলের বাচ্চাও হয়, তাকে চুমানি দেয়। তারপর বাড়ির সবচেয়ে নতুন বৌ সবচেয়ে নতুন গাইকে বা বলদকে চুমানি দেয়, আর বাড়ির সবচেয়ে পুরানো রাখোয়ালকে চুমানি দেয়, সে যদি গলগলা বুড়া হয়, তাকেই।"৭৬ গরু চুমানি ছাড়া আর একটি ব্রত একই সঙ্গে পালিত হয় — বাখর খাওয়ানো। গরুকে খাওয়ানোর প্রতিদিনের জাবের সঙ্গে লাউ ও পেঁয়াজ কেটে, অনেক সময় তাতে একটু গুড় মিশিয়ে বাখর তৈরি করা হয়। গরু চুমানির পর বাখর খাওয়ানো ব্রতেরই একটা অঙ্গ। গরুচুমানি ব্রতের দিন শিকারে যাওয়াও রাজবংশীদের আরএকটি পালনীয় বিধি। কোন কোন অঞ্চলে শিকারে গিয়ে বরা (শুয়োর) শিকার করে আনে।

জন্ম-মৃত্যু - সংস্কারের নিখুঁত ছবিও উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

বুড়িমার গোতে, রাজবংশী সমাজে সন্তান ধারন, প্রসব হওয়ায় বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে—

"সেই যখন বোঝা গেল বর্ষা শেষ হয়ে ফিরে এল আর ফিরে এসে শেষ হচ্ছে না, যখন বোঝা গেল এক অঘ্রায়নের ধান মাঠে দাঁড়িয়ে পচে গেল আর কত ভাদই বা হেউতি ছিটনো গেল না, রোয়াগাড়াও হল না, তখন থেকেই বুড়িমার গাওয়ের বৌরা পেটেলী হতে শুরু করেছিল। .....একদিন দেখা গেল দুখারু-টুলটুলির

বড় বেটা শানুর বড় বেটা দেরুর বৌ ডাউকী পেটেলী হয়ে ঘুরছে। আর একদিন দেখা গেল ভাসার বৌ চোপীও পেটেলী হয়েছে। কয়েকটা দিন কাটতে না কাটতেই ভাদইয়ের বৌ পেটেলী হয়ে গেল। কে কে পেটেলি হয়েছে সে কথা মনে রাখতে রাখতেই সানঝুর বৌ পেটেলী হয়ে বেরয়।"৭৭

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয়ে ওঠা বৌরা যথা সময়ে একে একে প্রসব করাও শুরু করল।

"ঠিক হিশেব করে বলা যাবে না, কবে থেকে সেই বর্ষায় এই বৌরা প্রসব শুরু করল। তখন ক্ষেতবাড়ি জল বাড়ি হয়ে গেছে। হালের মাথায় মরচে ধরেছে। তার মধ্যে ডাউকীর ব্যথা উঠলো। ক্ষেতবাড়ি, ঘরবাড়ি কাজ কিছু না থাকায় ডাউকীও মনের সুখে ব্যথা দিতে লাগল, ব্যথা চাপতেও থাকলো। .....সোন্দনীও সেই রাত দিনের বর্ষার মধ্যে যেন ডাউকীর প্রসব যত বেশি দিন ধরে করানো যায়, ততই বেশি দিন ধরে করাচ্ছিল। তবে সব প্রসব ব্যথা খাওয়ানোরই তো একটা শেষ আছে। ডাউকীর ছেলে হল। ডাউকীর ছেলে হওয়া শেষ হতে না হতেই চোপীর ব্যথা শুরু হল। সোন্দনী চোপীকে বলল, ' অত আলসিয়া করি খালাস হওয়া না যায়। খাট কেনে খাট' চোপী বলে কি খাটিম? কোটত খাটিম? চারি পুখে তো জল।' সোন্দনী বলে 'তোর প্যাটের জলতও তো ডিম পাড়িছে।' তবে চোপী বিশেষ ঝামেলা করেনি। সে একে বারেই প্রসব ব্যথা তুলে ছেলে বের করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার পেটেলী হল।"৭৮

জন্মের মত মৃত্যুও বুড়িমার গোতে এক স্বাভাবিক ও নিয়মিত ঘটনা। তবে জন্মের মত মৃত্যু তো অত ঘন ঘন আসে না। এবং মৃত্যু নিয়ে অত মাথা ব্যথা নেই কারও।

"বুড়িমার বাড়িতে কে কেন মরল এটা কখনও কেউ জানতে চাইত না তখন, সেই যখন সোন্দনীর স্বামী মারা গিয়েছিল। মানষি আর বেটিছোয়ারা বুড়ো হয়ে গেলে আধবসাহয়, আধবসা থেকে শোয়াবসা হয়, শোয়া বসা থেকে একদিন মরে যায়। এগুলো তো বসা মরা। মানষি বুড়ো হলে কাজ থেকে বসে যায় আর কাজ থেকে বসে গেলে মরে যায়। বুড়ো না হলেও মানুষ মারা যায় কত রকম ভাবে— কারও পেট ফুলে দম আটকে যায়, কারও মাথার গোলমাল হয়ে শ্বাস আটকে যায়, কারো সারা শরীরে ঘা বেড়িয়ে দম আটকে যায়। আবার 'বান' মেরেও দেয় কেউ। কখনো কখনো হঠাৎ হঠাৎ এক আধজন মরে যায় বটে তবে সাধারণত বুড়িমার বাড়ির মত এতবড় বাড়িতে এত মানুষ জনের মধ্যে সবাই টের পেয়ে যায় একজন মরণের দিকে চলে যাচ্ছে। তখন তাকে আর কেউ সংসারের কাজে ডাকে না। মানষিটা নিজেকে নিয়েই তখন এত জড়িয়ে থাকে যে তাকে আর সংসারে কেউ জড়াতে চায় না। আর মরণের দিকে চলে যাচ্ছে যে মরণের মানুষ, তাকে তো

কেউ কিছু করতে পারে না। ..... মানুষ যখন মরণের দিকে চলে গেছে তখন আর বুড়িমার বাড়িতে কেউ তাকে ঠেকনো দিত না। তেমন ঠেকনো যে আছে তা জানতও না।" ৭৯

এভাবেই একদিন বুড়িমার গোতের ঢেমনা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তামাক ক্ষেতে কাজ করতে করতেই ক্ষেতের পাশে পাঁজা করে রাখা পাটকাঠির দঙ্গলে শুয়ে মারা যায়। তিন চারদিন পরে আকাশে শকুন দেখে তার খোঁজ পড়ে। তার মুখাগ্নি করে বড়বাপা, ছোটদাদার আগের বাপের ছেলে।

জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি ইত্যাদি যেমন গোতের লোকের স্বাভাবিক জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত তেমনি প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয় যেমন খরা, বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা ইত্যাদিও স্বাভাবিক ঘটনা। বুড়িমার গোত তথা রাজবংশী জীবনে তাই এ সবের প্রভাবও প্রচুর।

"তিনবর্ষা বৃষ্টি নাই। রাত্রিভর বৃষ্টির জল সকালে ক্ষেত থেকে বের করে দেয়ার এমনই অভ্যাস যে বৃষ্টি যে শেষ পর্যন্ত হল না তা বুঝতে বুঝতেই পুবের বাতাস ফিরে যায় আর পাহাড় থেকে বাতাস এসে গায়ে কাঁটা জাগিয়ে দেয়। .....হিম শিশিরে যে মাটির শপশপ থাকার কথা, স্যাও হাল দিয়ে মাটিতে ওস খোয়াবার কথা, সেই মাটি সরু-মোটা এত ফাটলে ফাটা ও জাজ যেন মনে হয় এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পিঁপড়ে ওই ফাটল দিয়ে উঠে আসছে। প্রায় সব ধান তুষ হয়ে গেছে।"৮০

তবু চাষির একটু আশা সব শিসের ভেতর সব সময় তুষ থাকে না। কিছু যদি ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া, "আরও আরও একটা কারণ এক পৌরাণিক অভ্যাস, হালুয়া নিজে তার নির্ধারিত কাজ থেকে নিবৃত্ত হবে না, তাকে রোয়াগাড়ার সময় রোয়া গাড়তেই হবে, তাকে ক্ষেত নিড়ানোর সময় নিড়তেই হবে।"৮১

খরার সময় বুঝে শুনে চাষীকে ধান খরচ করতে হয়। কারণ ওই খরা কতদিন চলবে তা তো জানা নেই। 'এই খরার পাকে পরা বুড়িমার গোতে দু'দুটো বছর এই টাড়িতে কোনো নতুন বাচ্চার কান্না ওঠেনি।'

কারণ —" ধান ভেজানো বাতাস, ধান সেদ্ধর ধোঁয়া আর ধান ভুখাবার ধুলো শ্বাসের সঙ্গে যার ভেতরে যায়নি, তার পেটে ছোয়া আসে কোত্থেকে।"৮২ খরার মতো বর্ষার পাকেও পড়েছে বুড়িমার গোত। 'কোন কোন সময় এমন আসে যখন বর্ষার হিশেব দিয়ে আর বছরের হিশেব মেলানো যায় না। পাছত বর্ষা বললে যে যে বর্ষা ফেলে আসা হল সেটাই বোঝাবে তা হয় না। কারণ, সেই আগের বছরের বর্ষা, হয়তো তখনও চলছেই, তখনও শেষ হয়নি।' এই লাগাতার বর্ষায় সব হিশেব গোলমাল হয়ে যায়। "সেই বৃষ্টি কোথায় কবে, কখন ধরবে তার আভাস নেয়াও যখন অভ্যাসের বাইরে চলে গেল, তখন পরের ফলনের হিশেব, বর্ষার

হিশেব, বছরের হিশেবও গোলমাল হয়ে গেল। " ৮৩

খরা ও বর্ষার মত একবার শীত এসে আর যেতে চাইছিল না বুড়িমার গাঁও থেকে। "..... একবার নাকী শীত আর শেষ হয়নি, শেষই হয়নি, এখনো শেষ হয়নি। সে নাকী একবছর, দু'বছর ধরে শীত চলছে তো চলছেই, চলছে তো চলছেই। শীত যদি শেষই না হয় তাহলে বছর এক গেল, বছর দুই গেল বোঝা গেল কী করে? .....শীতের নিয়মটাই এই যত থাকে, তত বাড়ে। তাই শীত যত চলছিল, তত বাড়ছিল।"৮৪ এমন শীত হাঁস, কবুতর, গরু, বাছুর সব কাতর হয়ে পড়েছিল— নিজেদের আবাস ছেড়ে কেউ বেরত না। আর মানুষ গুলো " 'পারো', পুইয়ে শীতের প্রথম রাত তো সবাই কাটায়। যাদের মাঝ রাতেও শীত ধরে তারা এসে মাঝরাতেও 'পারো' পোয়ায়। সেবার শীত নাকী এমনই হয়েছিল যে দুই সারি আগুনের মাঝখানে মানুষ লাইন বেঁধে বসে থাকতো। ফরেস্টের বাঘ গুলো তো আগুন দেখে ভয় পায়, সেই দুই-তিন বছর জোড়া শীতে বাঘগুলোর নাকী আগুনের ভয় কেটে গিয়েছিল। তারাও এসে নাকী সেই দুই সারি আগুনের মধ্যে মানুষের সঙ্গে বসে বা শুয়ে আগুন পোয়াত। তখন থেকেই তো কথা থেকে গেছে— সেবারের ঠাণ্ডায় বাঘের আগুনের ভয় কেটে গেল।" ৮৫

এই সব ঋতু বিপর্যয় বুড়িমার গোতে চাষবাসে বদল নিয়ে এল। পূর্ববঙ্গাগত ভাটিয়াদের কাছে — ওরা শিখল 'জলচাষ', ভাটিয়া চাষ। ব্লক অফিস থেকে শিখল হাইইল্ড ধানের চাষ। উঁচু ডাঙ্গা জমিতে টমেটো, আলু, বেগুন চাষ শুরু হলো। কোথাও সরিষা চাষও হলো। গতানুগতিক চাষবাস থেকে ওরা বেরিয়ে এলো।

মহাকাব্যে যেমন হয়, এক একটা কাহিনি বলা হয়, আর সেই প্রসঙ্গে কখনও কখনও এক একটা উপদেশ, নীতিকথা, তত্ত্ব মেশানো হয়। দেবেশ রায়ের তিস্তাপুরাণে সে রকম তত্ত্ব কথার সন্ধান মেলে বহু স্থানে। যেন লেখক কিছুক্ষণের জন্য গল্পটা থামিয়ে দিয়ে তত্ত্ব কথাগুলো সেরে নেন। অথবা কথা বলতে বলতে মাঝখানে কোন তত্ত্বের অবতারণা করেন। পাঠকও মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শোনে। অপেক্ষা করে পরবর্তী গল্প বা কথার জন্য। যেমন 'পরজন্ম থেকে' অধ্যায়ে একই গল্প সময়ের ব্যবধানে ও পাত্রের ব্যবধানে নতুন নতুন আকার ধারণ করে। নতুন সোলংগার জন্য নতুন গাছ খোঁজার গল্প, ঘাটোয়ালের বুড়ো বয়সের গল্প। অথচ নতুন গাছ খোঁজার গল্প বলতে গিয়ে পুরনো সোলংগার নদী খোঁজার গল্প শুরু হয়ে গেল, তবে শেষ হলো না। এমনতর হওয়ার কারন বলতেই এসে পড়ল সময়ের তত্ত্ব।

"সময় হল তোমার দরকার মত একটা হিসেব। সে তুমি যদি সময় দিয়ে পাটা ওজন করতে চাও, তাহলে

সময়টাকে সেই মত বদলে বদলে নিতে হবে। তুমি যদি তোমার বড় নাতির প্রথম হাল ধরা থেকে একটা বৃত্তান্ত বের করতে চাও, তা হলে কাঁচা বাঁশ গাছ থেকে কঞ্চি পাতা ডাল কেটে ছেঁটে যেমন ধোয়া পাটা ঝোলাবার বাঁশ বানাতে হয়, তেমনি তোমার বড় নাতির প্রথম হাল ধরা থেকে কত সব ঘটনা তোমাকে কাটছাঁট করতে হবে। সময় মানে কোন মাপ নয়— অন্ততঃ বুড়িমার এই গাওটায়, সাত গোতের এই ভিটায়, দশনদী-বিশনদীর এই দেশে, ছয় হাট, দুই ঝারের এই পৃথিবীতে। সময় মানে তুমি মাটির তলায় কী গেড়ে রেখেছ তার জন্যে অপেক্ষা। যে সব গল্পে ইহজন্ম-পরজন্ম সব একাকার হয়ে যায় সে সব গল্পে সময়ের কোনো পরম্পরা থাকে না, যেন, একের পরে দুই সব সময় আসে না, যেন সব বছর জেঠাইয়ের পর আষোঢ় আসে না যেন, গরমের পর বৃষ্টি হবেই - এমন কথা নেই। " ৮৬

বৃহস্পতিবারে ঠিক হয়েছিল বুড়িমার গোত ধূপগুড়ির শনিবারের হাটে যাবে। শুক্রবার টাকু পাইকারকে এ কথাটা ধানরাম জানিয়েছে কিনা কে জানে। কারণ সবাই এখন ক্ষেতবাড়ির কাজে ব্যস্ত। এক এক জন এক একটা কাজ খুঁজে করে, শেষ হয়। কাজের এই বের হওয়া ও শেষ হওয়া প্রসঙ্গে এক তত্ত্ব বেরিয়ে এসেছে। " কাজ বের করাই প্রধান কাজ। বের করা মানেই কাজ হয়ে যাওয়া। শুধু সময় মত কাজটা চোখে পড়েনি বলে কত ছোট ক্ষতি থেকে বড় সর্বনাশ পর্যন্ত হয়ে যায়।"৮৭ — কাজ সম্পর্কে এমন এক সর্বজনীন তত্ত্ব— শুধু বুড়িমার গোতের মানুষের জন্য নয়—সবার জন্য—চিরকালীন।

'সময়' অধ্যায়ে ঝুলে থাকা বানার নেমে আসা প্রসঙ্গে - লেখক সময়ের কথা তুলেছেন। তিনি সময় ও টাইম দুটোকে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। "টাইম হল দশটা পাঁচটার হিশেব। যেমন —অফিস খোলার টাইম থাকে, অফিস বন্ধের টাইম থাকে, ইশকুল বসার টাইম থাকে, ইশকুল ওঠার টাইম থাকে। এমন টাইমের হিশেব দিয়ে কি আর সময় মাপা যায়, এমন সময়, যা চলছে তো চলছেই, যার ভিতর কখনো মানুষ ঢুকছে, কখনো মানুষ সে সময় থেকে খসে যাচ্ছে। জন্ম জন্মান্তরের হিশেবের কোনো টাইম নেই।"৮৮

'ধূপগুড়ি হাট' অধ্যায়ে বুড়িমার গোতের লোকজন ধূপগুড়ি হাটে আসার জন্য বনপথ, নদী পথ পেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় উঠেছে। পিচ ঢালা রাস্তায় হাটতে হাটতে কেন যেন তারা দলা পাকিয়ে যায় - সাবলিল ভাবে হাটতে পারে না। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন — "এ বোধহয় গ্রামের মানুষের শহরে এসে পড়ার বিহ্বলতা নয়। এ বোধহয় গ্রাম-নগরের কোন দ্বন্দ্বও নয়। এ বোধহয় উৎপাদন আর পণ্য, বা বিনিময় আর বাণিজ্য, বা কৃষি আর শিল্পের ভিতরের কোনো বিরোধও নয়। এ হয়তো সভ্যতারই মৌলিক বিহ্বলতা।" ৮৯

এ বিহ্বলতা সহজে উৎপাদিত হবার নয়। গল্পের শেষে শহর থেকে দশনদী-বিশনদী দূরের গ্রামে নাগরিক ছোঁয়ায় উৎপাদিত হলেও লেখকের কথায় ' তখনো অন্যত্র চারানো থাকবে।'

'মিরাকল' অধ্যায়ে বুড়িমাকে এক মিরাকল হিসেবে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক কিছু শাশ্বত কথা বলেছেন —

"প্রতিদিনের বেঁচে থাকার জন্যে, প্রতিদিনের বেঁচে থাকার মধ্যেই হয়তো মানুষের এক অদৃশ্যের বড় দরকার। সে অদৃশ্য কখনো কখনো অশ্রুতও বটে। স্পর্শাতীতও বটে। তবে মানুষ সেই সেই অশ্রোতব্যতা ও অস্পর্শনীয়তা অতিক্রম করতে চায়। আর আশ্চর্য, দৃশ্যতাও অতিক্রম করতে চায়। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ দেখছে এমন কিছুকে মানুষ অদৃশ্য কিছুতে বদলে নেয়। অথচ সেই পরিবর্তন থেকে সে আবার কিছু শুনতে চায়, সে আবার কিছুর স্পর্শ চায়। মিরাকল ছাড়া মানুষ বাঁচে না।" ৯০

মানুষ তার বাঁচার প্রয়োজনেই শ্রোতব্য, দৃশ্য কিছুর মধ্যেই অশ্রোতব্য, অদৃশ্য কিছু যা অলৌকিকও বলা যেতে পারে, তা আরোপ করে।

'কথোয়াল' অধ্যায়ে কাছুয়া মোহম্মদ ঘোষণা করে যে সে আর ডাঙ্গির মাঠের ধানের ভাগ নেবে না — কারণ ওটা খাশ জমি। পাঁচ কম কুড়ি বছর আগেই তা খাশ হয়ে ছিল। তখন সে সেকথা জানায়নি। আজ পনের বছর পর সেই ঘোষণা কী অর্থ বহন করে! কথা যথা সময়ে না বললে যে তা ক্রমশঃ জটিল আকার নিতে পারে সে প্রসঙ্গে এক কথার তত্ত্ব লেখক উপস্থাপন করেছেন। কখনো কথাকে বৃক্ষ বলা হয়েছে।

"কথা তো স্যালায় একখান গোটা বৃক্ষ। যতখান সময় ফেলি রাখিবেন, ততখান সময় মাথা তুলিবে, পা চালাবে, ডালপালা মেলিবে, শ্বাস দিবে, শ্বাস নিবে, ছায়া দিবে, রোদ দিবে। কথা তো কহি দিবার নয় । কথা তো গাড়ি রাখিবার, বৃক্ষের নাখান গাড়ি রাখিবার।" ৯১

'গোত্রনারী' অধ্যায়ে গোত্রনারী বুড়িমার জন্ম জন্মান্তর ধরে বেঁচে থাকা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক জন্মান্তর সম্পর্কে - এক তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছেন— "জন্মান্তর যা ঘটে সে তো জন্মেরই ভিতর। জন্মও যে চলতে থাকে সেও তো জন্মান্তরেরই সঙ্গে সঙ্গে।" ৯২

'মানুষের একটা আত্মপরিচয় না থাকলে মানুষ জন্মান্তর ধরে বাঁচবে কী করে।' বুড়িমার গোতের মানুষদের বিশেষত যারা বয়সে ছোট তাদের বাঁচার, জন্মান্তর ধরে বাঁচার উপায় বলতে গিয়ে উক্ত মন্তব্যটি লেখক করেছেন। এই আত্মপরিচয় জমির দাগ নম্বর দিয়ে হয় না, পঞ্চায়েতের সীমানা দিয়েও হয় না। এর জন্য চাই

গোতের পরিচয়।

'যাত্রা' অধ্যায়ে বুড়িমা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে গোতের লোকেরা তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়ার পথে যাত্রা করে হাতিকে সেবা দিতে। যাত্রার উদ্দেশ্য জানা থাকলেও পথ জানা নেই। এই যাত্রা ও ফিরে আসা প্রসঙ্গেই লেখকের এক চিরন্তন উক্তি—

"প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোনো যাত্রার শেষ নেই, সব যাত্রাই প্রত্যাবর্তনের দিকে যাত্রা। নিজের অক্ষদণ্ড ঘিরে প্রত্যাবর্তনের দিকে যাত্রা।" ৯৩

এত বয়সী এত বিস্তৃত একটা গোত তাতে রাজনীতি আসবে না তা হতে পারে না। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দেই রাজনীতিও বুড়িমার গোতে ঢুকে পড়েছে। ৬৪, ৬৫, ৬৬ সালে খরার বছরের আগে থেকে প্রথম ৬৭-তে, দ্বিতীয় ৬৯-তে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার। মাঝে ৬৮-তে বড় বানা, তারপর ৭৭-তে এ বামফ্রন্টের শাসনকাল পর্যন্ত উপন্যাসের ঘটনাকালের বিস্তার। এরমধ্যে কংগ্রেস সরকার আমলের খরার কথা আছে। খরার কবলে পতিত বুড়িমার গোত তথা উত্তরবঙ্গের কৃষকদের ওপর লেভি চাপানোর কথা আছে। লেভি যাতে না দিতে হয় সেজন্য ধূপগুড়িহাটের গদিয়ালের গদিতে বিভিন্ন অঞ্চলের জোতদাররা মিটিং করলেও গদিয়াল লেভির এজেন্টের চক্রান্তে বিডিও সাহেব এসে সবাইকে লেভি দেওয়ার পরামর্শই দেন। বুড়িমার গোতও সেই মত লেভি দিতে বাধ্য হয়। এমনকি লেভি দিতে গিয়ে এজেন্ট গদিয়ালের ফাঁদে পড়ে।

উত্তরবঙ্গে জোতদারি প্রথার রেশ তখনও চলছে। শশঙ্গি জোতদার, ছোটুমিয়া, ভোলারাম জোতদার, মোটাশিলা জোতদার, নাউধিয়া জোতদার, টাকু পাইকার, কাছুয়া মহম্মদ, গান্ধারু জোতদার, দিনু মাষ্টার, হরিবোল জোতদার প্রমুখদের উপস্থিতিতে লেভি সম্পর্কে আলোচনা হয় গদিয়ালের গদিতে। বেনামীতে খাশ জমি লুকিয়ে রাখা, আধিয়ার উচ্ছেদের মতো কিছু কথা উপন্যাসে উল্লেখ থাকলেও এদের ভয়ঙ্কর রকমের শোষক মূর্ত্তি আঁকা হয়নি। বরং লেখক জোতদার আধিয়ার সম্পর্ক বুঝিয়েছেন এভাবে— "জোতদার আধিয়ার একই সঙ্গে বাঘ-সাপ-হাতি-বন্যা-শীতে নিজেরা বেঁচেছে, মরেছে, জমির ফলন বাঁচিয়েছে আবার বাঁচাতে পারেনিও হয়তো। জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স - কৃষিতে সরকারী ব্যবস্থায় এসেছে বড়জোর সোয়া'শ বছর । তাই এখানকার জোতদারও নিজেকে 'হালুয়া' বলে বা এখানকার হালুয়াকে তার বৌ ভালোবাসার ঠাট্টায় 'রে দেউনিয়া' বলে ডাকে। এই প্রায় নির্বাক রাজবংশী কৃষকের মজ্জায় এক স্বাধীনতার পরাক্রান্তবোধ মিশে আছে। সে বোধ কারো কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে যেতে দেয় না।"৯৪

ধূপগুড়িহাটে একদিকে জোতদারদের লেভির মিটিং চললেও এবং মিটিংয়ে লেভি দেওয়ার সপক্ষে সিদ্ধান্ত হলেও ঐ হাটেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল লেভি বিরোধী শ্লোগান ও মিটিং করে। বিশেষত বাংলা কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টিকে এই আন্দোলনে দেখা যায়। কমিউনিস্টরা শ্লোগান দেয় 'লেভি নোটিশ-নাহি চলে গা, নাহি চলে গা।' লুকিয়ে রাখা খাশ জমি বের করারও দাবি জানায়, 'ছুপা খাশ জমি বাহার করো, বাহার করো।' ' আধিয়ারের লেভি নাই, লেভি নাই। বাধ্য হয়ে বুড়িমার গোত লেভি দিয়ে দিলেও এই সব মিটিং ও শ্লোগান তাদের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে তোলে। 'দে দে সরকারক পাল্টি দে' মনোভাব তৈরি হওয়ার ফল হল ৬৭ সালে সরকার বদল, প্রথম অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৮-তে জলপাইগুড়ির বড় বন্যা। ৬৯-এ ফের ভোট। পুনরায় আরও বেশি ক্ষমতা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসা। এবার শুরু হয় খাশ জমি দখল, বেনামী জমি উদ্ধার, ভূমিহীন কৃষকদের খাশ জমি বন্টন, আধিয়ারি পাট্টাবিলি ইত্যাদির কাজ। সেই সুবাদে ধরনী জোতদারনীর জমি দখল করতে চায় তারই এক আধিয়ার, শিলিগুড়ি থেকে আসা এক আত্মীয়ের পরামর্শে। জোতদারনীর প্রতিরোধে ও বুড়িমার গোতের লোকেরা তাদের নিজেদের জমি দখল হয়েছে ভেবে দলবল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ায়, সেই আধিয়ার দখলের চেষ্টা থেকে বিরত হয়। দলহীন ঝাণ্ডা দখল নিতে পারে না। আধিয়ার হার মানে।

কিন্তু আধিয়ারের এই হার ছোটদাদার মনে ভাবান্তর আনে। এই লালঝাণ্ডা, এই দখল তাকে ভাবায়। একদিন পাছাড়াঙ্গায় হাল সেরে তার মনে হয়, ' মুই আছো তো ক্ষেতবাড়ি আছো, হাল আছো, ফলন আছো। মুই না তো ক্ষেতবাড়ি নাই, ফলন নাই, হাল নাই। মোর এই হাল খান আর আকাশের মেঘখানের মধ্যি খানত কোটত আছে জোতদার? জোতদার কায় হয়? কায় জোতদার?' নিজের শ্রমের মূল্য, অধিকার সম্পর্কে ছোটদাদা সচেতন হতে থাকে। জোতদার যে বিনাশ্রমেই জমির ফসল ভোগ করে এ প্রশ্ন ছোটদাদার মনে উঁকি দেয়।

দলগাঁও চা-বাগানে গিয়ে ছোটদাদা স্বচক্ষে চা বাগানের পতিত জমি দখলরত কৃষকদের ভূমিকর্ষণ দেখে। প্রত্যেকের হালের মাথায় লালঝাণ্ডা লাগানো। এখানে শ্রমিক নেতা কাপুর কালী কমরেড ও কৃষক নেতা হরিমোহনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়। কালী কমরেড ছোটদাদাকে বোঝায় সে যেন তার নিজের গ্রামে, পাশের গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষজনের কাছে জোতদারের বিরুদ্ধে ' সারা বছর চাষ করো অথচ সারা বছরের খাওয়ার ধান পাও না। করজা ধানের সুদ দিতে তোমার ভাগ খালি হয়ে যায়।' এই সব অত্যাচারের কথা

বলাবলি করে। কাপুরের গান, কথা, কালী কমরেডের কথা, ছোটদাদাকে ভাবায়—

'মুই না খাউয়াইয়া না হই, মুই ধান করজা নেয়ার আধিয়ার না হই, মোর কুনো জোতদার নাই, মুইও জোতদার না হই, মুই কার নখত লড়াই করিম।' বরং তার বিশ্বাস চা বাগানের দখলই জমিতে জোতদারি হবে। 'বাবু এইটে তো এ্যালায় জোতদারি হবে', তার ধারণা—'আধিছাড়া হাল নাই'।

কিন্তু কমরেডরা তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করে, তার ভেতর বঞ্চনা, ক্ষোভ তৈরি করার চেষ্টা করে — অধিকার অর্জনের দাবিতে লড়াকু কমরেড বানানোর চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফল লক্ষ করা যায়— 'জন্মান্তর' অধ্যায়ের শেষে ছোটদাদা ডাঙ্গির মাঠের জমি যা কাছুয়া মহম্মদের খাশ জমি দখল করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেজন্য লালঝাণ্ডা দরকার। চা-বাগানের জমি দখলকারী চাষীদের বাড়িতেও যায় কিন্তু ঝান্ডা না পেয়ে ওকসি পাতার ঘর বানিয়ে জমি দখল নিতে চায়।

ডাঙ্গির মাঠের এক টুকরো জমি দখল নেওয়ার সময় অগুনদের সঙ্গে আলাপে তাকে আধি জমি দিতে চাওয়া হলে সে বলে, ' তোমরা তো দিবারই পারেন। মোর আপন জমি মোকই বানিবার লাগিবে'। সে আধি চায় না। জমির পুরোপুরি অধিকার চায়। ঝাণ্ডাহীন এক দখল সে রাখতে পারেনি জোতদারনীর আধিয়ারের মত। অগুনদের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তাকে নির্বাসনে যেতে হয়।

লেখক দেখিয়েছেন চা বাগানের পতিত জমি কিন্তু সমবেত প্রয়াসে দখলে আসে। ঝাণ্ডা, শ্লোগান, একতা দখল নিতে সাহায্য করে। এমনকি এফিডেবিট করে ভিক্টোর ঘারোয়া ওরাওঁ শাম্মী কাপুর হলে বাগানের বাবুরা আপত্তি করেও ব্যর্থ হয়েছে—একতার জোরে।

৬৭ ও ৬৯ -র যুক্তফ্রন্ট সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো অপারেশন বর্গা। 'অপারেশন বর্গা' অধ্যায়ে এ ব্যাপারে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। অপারেশন বর্গার বাধা এসেছিল আধিয়ার ও জোতদার উভয় দিক থেকেই। আধিয়ার চাইল না আধিয়ার লিস্টে তাদের নাম নথিভুক্ত করাতে, বর্গাদার হিসাবে নিজের নাম রেকর্ড করাতে। ''সরকার কি মোকে জমি দিবে আধিকরিবার তানে? স্যালায় মুই কেনে লিখিদিম—মুই এই জমিখানর আধিয়ার?'' ৯৫ আবার 'জোতদারের ভয়—একবার রেকর্ড হয়ে গেলে আধিয়ারকে সে শাসাতেও পারে না, উচ্ছেদও নিতে পারবে না। আধিয়ার মালিক হয়ে যাবে।'

এরকম এক পরিস্থিতিতে সরকারকে অপারেশন বর্গায় নামতে হল। তবে '৮০ থেকে জলপাইগুড়ির চাষে আবার সুদিন ফিরে এসেছে। জোতদার আধিয়ার দুইয়ের ঘরেই একটু ধান ও পয়সা এসেছে। খাবার ধানের

জন্যে আধিয়ার কে জোতদারের কাছে হাত পাততে হয় না। এবার আধিয়াররা ভাবতে শুরু করেছে—' সরকার কী রেকর্ড করিবার কহছে? দে, করি দে রেকর্ড আধিখান।'

শশঙ্গী জোতদার চায় সাকোয়াঝারের জমির আধিয়ার হিসেবে দুদুয়ার ভাটিয়াদের নাম রেকর্ড করাতে। তাতে রাজবংশী আধিয়াররা ক্ষেপে উঠল। সমাধান করল ভাটিয়ারাই—নাম রেকর্ড থেকে বিরত থেকে।

সরকার পরিবর্তনের সুফল শুধু বর্গারেকর্ড বা অপারেশন বর্গা, খাশ জমি উদ্ধার ইত্যাদি কাজেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামগঞ্জ গুলিতে নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তা পাকা করা, চাষে আধুনিকীকরণ, আইআরএইট, তাই চুং ইত্যাদি হাইইল্ড ধানের চাষ জলসেচের জন্য সেলো পাম্প, এক একটি বড় জোত ভেঙে অল্প জমিতে অধিকবার, অধিকফসল শুরু হল। বুড়িমার গোতের লোকেরা এই ব্যবস্থা মেনে নিল। গ্রামস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে দেবার লক্ষে বুড়িমার গ্রামেও 'বুড়িমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়' স্থাপিত হল। ভ্যানে করে ছাত্রছাত্রী এল। শাড়ি পড়া দিদিমণি এলো। সেই দিদিমণিকে দেখে বুড়িমার গোতের মেয়েরা, পরে বৌয়েরা শাড়ি পরা শিখল। কৃষিনির্ভর বুড়িমার গোত নতুন কৃষি ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হল, শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবর্তন সূচিত হল।

'শেষ' অধ্যায়ে বুড়িমার, বিসর্জন। বুড়িমা যার অমরতা এতদিন পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে তাকেও তো একসময় চলে যেতে হবে। যে গোত্রনারী বানা ঝোলা দেখে, হাতির ডুবে যাওয়া দেখে তার অলৌকিক শক্তিতে বাস্তবে পরিবর্তন আসে, কালের নিয়মে তাকেও একবার বিসর্জনে চলে যেতে হয়। এই বির্সজনের ভার পড়ে একজন প্রকৃত সর্বহারার ওপর—যার জোত নেই, গোত নেই, জন্ম পরিচয় নেই, যে জোতদার নয়, আধিয়ার নয় — শুধু শ্রমসর্বস্ব এক সর্বরিক্ত মানুষ। তার হাত দিয়েই বুড়িমার বিসর্জন হবে - বুড়িমার নির্দেশেই।

এখানে লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও গভীর জীবনদৃষ্টি পরিস্ফুট হয়েছে। বামপন্থী সরকারের ভূমিনীতি, জোতদারি বিলোপ, খাশজমি উদ্ধার, অপারেশন বর্গা ইত্যাদি কাজের ফলে যে উন্নয়ন যেখানে বিঘা প্রতি ১৫/২০ মন ধান ফলে সেখানে মানুষের আর অভাব নেই। কিন্তু লেখক এই উন্নয়নকেও যথার্থ উন্নয়ন বলতে চাননি। এ ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন। এতে ধান বিক্রি করে টাকা আসবে কিন্তু মানুষের প্রকৃত ক্ষুধা মিটবে না। তাই ছোটদাদা জোত-জমির অধিকার পেয়েও ক্ষুধার দিকেই চলে যায়। ফিরবে সেদিন, যেদিন পাহাড়ে ঝুলে থাকা বানা নামবে, যে দিন নদী খোঁজা মানষি ফিরে আসবে আর ডুবে যাওয়া হাতি পাখা মেলে উড়বে, সেদিন

'মানষির হাতের ফলন মানষির পেটের ক্ষিধার মুখত নিগিবার তানে ফিরবে। ফিরবে যে নদী পথে গেছে সেই নদী পথেই নদী ধরে ধরে।

লেখকের কমিউনিস্ট বিশ্বাস এখানে পৌরাণিক বিশ্বাসে রূপ নেয়। কমিউনিজমের উৎপাদন বন্টনের সাধারণ নিয়মেও মানুষের ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই। তবে মানুষের ক্ষুধা একদিন মিটবে। তাতে কয়েকজন্ম অপেক্ষা করতে হতে পারে। সেই পৌরাণিক পথ বড়বাঁক, কুলজুয়া,দুদুয়া গরাতি, নোমাই, গোলুন্দি, আংরাভাসা— গোলন্দি, নোমাই, গরাতি, দুদুয়া, কুলজুয়া হয়ে বড়বাঁক।

চরিত্র ঃ ছোটদাদা

তিস্তাপুরাণের একটি বিশিষ্ট চরিত্র ছোটদাদা। উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়ে তার উপস্থিতি। গোতহীন, জোতহীন, জারুয়া, ঢেমনাপুত্র ছোটদাদা যথার্থ অর্থেই সর্বহারা। তার একটা নাম পর্যন্ত নেই। ছোটদাদার মা অগুনের দিদি, ধাপগঞ্জে যার বিয়ে হয়েছিল, কোন কারণে বুড়িমার গোতে ফিরে আসে এবং ঢেমনার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, সেই ছোটদাদা। ধাপগঞ্জের স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বড়দাদা। বড়দাদার একমায়ের পেটের সন্তান বলে ছোটদাদা।

ঢেমনা, বুড়িমার গোতের কেউ নয়। কোন এক নিশিডাকা মানুষ বুড়িমার গোতে এসে আর ফিরে যায়নি, থেকেই গেছে। তারই সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে অগুনের ধাপগঞ্জের দিদির। তারই পেটে ছোটদাদার জন্ম। বুড়িমার গোতের সঙ্গে ছোটদাদার যে ক্ষীণ সম্পর্ক তা ঐ মায়ের সূত্রে।

এই ছোটদাদা ক্রমে উপন্যাসের অন্যতম নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাকেই পাঠানো হয়েছে ধূপগুড়ি ব্লক অফিসে লেভির খবর আনার জন্য। গরুচুমানির দিন অসতর্কভাবে হলেও তারই কপালে গোত্রপ্রধানা বুড়িমা তিলক পরিয়ে দিয়েছে। তাকেই ডেকে বুড়িমা অর্পণ করেছে তার বিসর্জনের ভার। এই অবস্থায় পৌঁছতে তাকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে হয়েছে। একটি জোতদার শাসিত পরিবেশে, কোন জোতদারের বাড়িতে, ঢেমনা, ছোটদাদা, ছোটদাদার মা'র মতো নরনারী শুধু খেয়ে পরে কাটিয়ে দেয়। এদের পৃথক কোন অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেই না। ছোটদাদার মধ্যেও প্রথম দিকে সেরকমই স্বাতন্ত্র্য হীনতা লক্ষ করা যায়। সে যে ধূপগুড়ি ব্লক অফিসে লেভির খবর আনতে গেছে তা বুড়িমার গোতের নিজস্ব লোক নয় বলে। একটু আলগা ভাবে খবর নিয়ে আসা।

পাছাডাঙ্গায় বর্ষার নতুন জলে সে প্রায় সারাদিন চাষ করেছে। ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফিরে কোন অধিকার নিয়ে

খাবার চাইতে পারেনি। একটু আলগা ভাবেই, কাউকে নির্দিষ্ট না করে 'খোয়া দিবেন কায়' বলে হেঁকেছে। অবশ্য এই সংকোচকে লেখক রাজবংশী সমাজেরই 'নীরবতা চর্চ্চার সমবায়িক অভ্যাস' বলেছেন।

দলগাঁও চা বাগানের পতিত জমি দখল দেখতে গিয়ে চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা, কাপুর কালী কমরেড এবং কৃষক নেতা হরিমোহন এর সঙ্গে ছোটদাদার আলাপ হলে এবং তারা তাকে অধিকার সচেতন প্রকৃত জমির মালিক তৈরি করতে চাইলে প্রথমে তার অর্থ সে বোঝেনি। তার পুরনো অবস্থাই তার কাছে সঠিক অবস্থা—এরকমই প্রতিক্রিয়া জানায়। চা বাগানের জমি দখলকে বড়জোর সে আধি বোঝে। ' জমি যদি বাগানই আধি দিয়ে থাকে, ওই বাবুকে, আর ওই বাবুই যদি ওদের আধি দিয়ে থাকে তাহলে এত ঝাণ্ডা ঝুণ্ডি পাট্টি পুট্টি কেন'? কাপুর, ছোটদাদাকে কিষাণ কমরেড বলে সম্বোধন করে কিষাণ মজদুর একাই গড়ে তুলতে বলে এবং পুঁজিবাদ সম্পর্কে অবহিত করে। " ই দুনিয়াকো দুশমন হ্যায় মালিক লোক, পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ নাহি মাংতা, কিষাণ মজদুর কো জানে, মজদুর কিষাণ কো জানে। ই হামারা বাগানকো মালিক, ঔর তোমরা মনকো ক্ষেতি জমিকো মালিক, সব হ্যায় পুঁজিবাদ। কিষাণ ঔর মজদুর কো একাই হোনেসে পুঁজিবাদ খতম হো যায়গা।"[৯৬] পুঁজিবাদ সারা জীবন শ্রমিক কৃষককে আলাদা করে রেখেছে, তাদের এক হওয়া দরকার কাপুর এই শিক্ষাই দেয় ছোটদাদাকে। সংগ্রামের গানও শোনায় ' হাম ভুগসে মরণে ওয়ালে'— কিন্তু তবুও ছোটদাদা বলে 'মোর তো কুনো লড়াই নাই। কার নখত লড়াই করিম? কী লড়াই করিম?' কাপুর ছোট দাদাকে যে জায়গাটাতে নিয়ে যেতে চাইছে সেখানে কিছুতেই নিতে পারছে না, কিছুতেই বোঝাতে পারছে না - সে বঞ্চিত, শোষিত। এবার কালী কমরেড ছোটদাদাকে বোঝাতে লেগে যায়। কালী কমরেড জোতদারি শোষণের কথা বলে। তাকে আধিয়ার জোতদার সুদের কথা বলে।

কিন্তু ছোটদাদা জানায় যে তাকে জমি চাষ করে কাউকে কোন সুদ দিতে হয় না। "মুই না খাওয়াইয়া না হই, মুই ধান করজা নেওয়ার আধিয়ার না হই, মোর কুনো জোতদার নাই, মুই জোতদার না হই, মুই কার নখত লড়াই করিম?"[৯৭]

ছোটদাদার লড়াইটা ঠিক কার বিরুদ্ধে বুঝে উঠতে পারেনা। বরং সে জানে আধি ছাড়া চাষ নাই। কিন্তু কালী কমরেড তাকে পুরাচাষ পুরা জমির তত্ত্ব বোঝায়। সেই বুঝ নিয়ে সে গোতে ফেরে। কালী কমরেড, হরিমোহন কাপুরদের কথা গুলো তার মনে গেঁথে যায়। সে ভেতর থেকে প্রস্তুত হতে থাকে।

শিকার শেষে ঘরে ফেরার সময় একান্তেই সেই কথা গুলি প্রশ্নের আকার নেয়। "মোর কেনে ধান কাটা

থাকিবে। মোর কেনে ক্ষেতবাড়ি থাকিবে? মুই কার এই ক্ষেতবাড়ির, মুই কায় হম এই ধান কাটার? ছোটদাদার অনন্য নির্ভর স্বয়ম্ভরতা চুর চুর ভেঙে পড়ছিল।" ৯৮

ছোটদাদার মনে পড়ছিল কাছুয়া মহম্মদের ডাঙ্গির মাঠের জমির কথা। সে জমি খাশ হওয়া সত্ত্বেও বুড়িমার গোতে আধিয়ারী রেখে কাছুয়া মহম্মদ তা এতদিন ভোগ করে চলছিল। ছোটদাদার মনে যা এতদিন প্রশ্ন ছিল, আজ তা হ্যাঁ বোধক ভাবনায় আকার পায়। সে বলে — 'এই জমিখান এই ডাঙ্গির মাঠখান খুলা পড়ি আছে। দখল নিম'।

এতদিন যে ডাঙ্গির মাঠ কাছুয়া মহম্মদ মিছা করে রেখে ভোগ করছিল, ছোটদাদা তাকে তাকে সাচ্চা বানাতে চায়। "মোর কি কুনো গোত আছে? মোর গোতও নাই, জোতও নাই। মোর একখান সাচা আছে। মুই নিজে সাচা হম। মুই ডাঙ্গির মাঠটাক সাচা বানাম।"৯৯

যে ছোটদাদার মনে এতোদিন কোন অধিকার সচেতনতা ছিল না, সত্য মিথ্যা ধারণা ছিল না, বঞ্চনা কাকে বলে জানত না। তার মনে আজ ডাঙ্গির মাঠ সাচা করার, দখল করার ইচ্ছা জেগেছে।

ক্রমশ সে ইচ্ছা প্রবলতর হলে দখল সফল করতে হাল, ঝাণ্ডা জোগাড় করার জন্য চা বাগানের দিকে যায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তখন একা একাই জমির ওপর ওকসি পাতার ঘর বানিয়ে দখল ঘোষণা করে। কিন্তু গোতের লোকেরা তার দখল অস্বীকার করে, তাকে তাড়া করে ; পাঠিয়ে দেয় নির্বাসনে।

ছোটদাদা বুঝতে পারে ঝাণ্ডাহীন, দলহীন, হালহীন দখল সফল হয়না। যে শিক্ষা সে কালী কমরেডদের কাছ থেকে পেয়েছে তার পুরোপুরি প্রয়োগ সে করতে পারেনি। তাই এই ব্যর্থতা।

"ছোটদাদা স্বাধীন হতে চেয়েছিল। কোন অধীনতা থেকে স্বাধীন তা জানে না.....ছোটদাদা জানে না স্বাধীন হওয়ার পরের ক্ষিধে কী করে মেটানো যায়। .....সে এমন একা দখল ঘোষণা করে দিয়েছে যা আধি থেকে ছাড় নয়, রোজগিরি থেকে ছাড় নয় অথচ সে দখলের পরও ক্ষিদে তেষ্টা পায়।"১০০ অর্থাৎ এই দখল শুধুই দখল। দখল করে স্বাধীন হয়ে, স্বাধীন উপার্জনের ব্যবস্থা এতে নেই। 'এতে আত্ম প্রতিষ্ঠার বাসনা আছে, চেষ্টা আছে কিন্তু সফলতা নাই।'

তাই একক প্রচেষ্টার দখল বুড়িমার গোতের সমবেত আক্রমণের কাছে মাথা তুলতে পারে না। তাকে পালিয়ে যেতে হয় — নির্বাসনে।

সে নির্বাসনে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ইউ পি, পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, আসাম, বাংলার বর্ধমান,

নদীয়া বিভিন্ন জায়গায় ঘোরে। দেখে নতুন চাষবাস, নতুন নামের ধান, রাসায়নিক সার, অধিক ফলন। উন্নয়ন। কিন্তু এ অভিজ্ঞতাও হয় — তার মত মানুষের বউ ছেলে পুলে নিয়ে মাসিক আয় দু'হাজার টাকা। 'খোয়া আছে , অসুখ আছে, রেলের টিকিট আছে, কামের তিন চারিমাসে দেখিবেন হাতত আর অ্যানং টাকা নাই যে অকাজের চারি মাস পারি দিবেন।'

প্রায় ত্রিশ বছর বাইরে কাটিয়ে সে এই অভিজ্ঞতা গুলো সঞ্চয় করে। সে বার্নেশের হাতি ডোবা হয়ে গোতে ফেরে। দেখে এখানেও উন্নয়নের ঢেউ। পঞ্চায়েতের রাস্তা, হাইইল্ড ধানের চাষ, পাম্পের জল, বুড়িমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাড়ি পরা মেয়ে বউ। কিন্তু এসব কিছু যেন তাকে উৎসাহিত করতে পারেনা। কারণ এসব তো তার চেনা।

এবার বুড়িমার গোতের বিসারুরা তাকে স্বেচ্ছায় ডাঙ্গির মাঠের অধিকার দিতে চায়।

বিসারু যে এখন গোত্রপুরুষ, বুড়িমার পরেই যার স্থান। সে ছোটদাদাকে লক্ষ করে বলে - "তো মুই কহো কি—ঢেমনাক মোর জোয়াই বলি স্বীকার করিবার লাগে। ঢেমনা ঢেমনা না হয়। মোর বুড়িমার গোতের এক বিয়াতী মাইয়ার বিয়ার পরের ভালবাসার মানষি। আর মোর ছোটদাদা ঢেমনা বেটা না হয়, জারুয়া না হয়, গোতছুট না হয়। মোর বেটির ঘরের ছোয়া, ছোটদাদা। .....ছোটদাদা মোর গোতের মানষি।..... তোমরাক সগাক কহি, হামরালা ডাঙ্গির মাঠের ঢেমনার ক্ষেতবাড়িখান ছোটদাদার নামে লিখি দেই। মোর গোতের মানষি হইয়া ছোটদাদা এইটে জোত বানাউক।" ১০১

এভাবে ছোটদাদা তার অধিকার ফিরে পায়—পায় স্বীকৃতি। কিন্তু — সে নইদারিঘরে বড় দাদার পাশে শুয়ে স্বপ্ন দেখে — প্রতিধ্বনিতে শুনতে পায় ছোটদাদা। "এক খান বেলায় তোর জোত হইল। তোর গোত হইল। অ্যালায় তুই জোতদার গোতদার হবু?.....আবার শোনে ছোটদাদা তোর জোত নাইরে, তোর গোত নাই। তুই চলি যা, তুই চুলি যা। ঢেমনার বেটা, জারুয়া, বনুয়া, তোর নি-জোতে, নি-গোতে চলি যা। সেইটে তোর তোক নাখান মানষি থিক্যা আলগ করি চিনা না যায়। সেই সব পৃথিবীর ভিতরত চলি যা, চলি যা। মানষির ক্ষিধার পাকে চলি যা।"১০২ যখন নদী খোঁজা মানুষ ফিরবে, ডুবে যাওয়া হাতি পাখা মেলে উড়বে তখন সেদিন যেন সে ফিরে আসে—অর্থাৎ সত্যকে জানা হবে, পুরাণ বাস্তব রূপে দেখা দেবে তখন যেন সে ফেরে ' মানষির হাতের ফলন মানষির পেটের ক্ষিধার মুখত নিগিবার তানে।' ক্ষুধার নেতৃত্ব দেবার জন্য।

ছোটদাদা এও শুনতে পেয়েছিল যে এক মনের জায়গায় বিশমন ধান হচ্ছে, 'এতখান ফসল মানষির

ক্ষিধার তানে না, টাকার তানে।' আধুনিক চাষবাস, পরিবর্তন ক্ষিধার তানে না, টাকার তানে। 'ফলনে মানষির ক্ষিদা মেটে নাই। বরং অর্থের আকাঙ্খা বেড়েছে'।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী লেখক এই পরিবর্তনকে ধনতান্ত্রিক পরিবর্তন রূপে দেখেছেন। অধিক ফলন হলেই শুধু চলবে না—চাই সুষম বন্টন। তা না হলে অধিক ফলনেও মানুষের ক্ষুধা মিটবে না। মানুষ অধিক ফসল বিক্রি করে অর্থোপার্জন করবে। টাকা জমাবে। তাই ছোটদাদাকে পাঠিয়ে দিতে চান ক্ষিধার দিকে। মানুষের ক্ষেতের ফলন মানুষের মুখে তুলে দিতে সে আবার ফিরে আসবে। আসবেই বলে লেখক বিশ্বাস করেন। তাতে তিন চার মানব জন্ম লাগলে লাগবে। ঝটিতি কোন বিপ্লব বা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়, তিন চার জন্মের পৌরাণিক পথে সেই শুভক্ষণের আসার ইঙ্গিত দিয়ে লেখক উপন্যাস শেষ করেছেন।

বুড়িমার কি হল! বুড়িমা গমনোন্মুখ ছোটদাদাকে ডেকে বলল—'মোক নিগি যা পিঠত বুকুনি বান্ধি। তিস্তার জলত মোর বিসর্জন দে। মোক তিস্তাত ভাসি দে।'

গোত্র প্রধান গোত্রনারী প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক বুড়িমার প্রস্থানের সময়কাল উপস্থিত। বানাঝোলা দেখা, হাতি ডোবা দেখা, এরকম অজানা, অদৃশ্য অনাগত কালকে দেখা বুড়িমার বিদায় নিয়ে নতুনের হাতে নতুন ব্যবস্থা আনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে। এক পুরাণ শেষ হয়, আর এক পুরাণ শুরু হয়। যে নদী পথ ধরে বুড়িমাকে বিসর্জনের নিয়ে যাওয়া হয়, সেই নদীপথে ছোটদাদা ফিরবে তিন চার মানব জন্ম পর ক্ষেতের ফলন পেটের ক্ষিধের কাছে তুলতে তুলতে। লেখক আগামী নতুন পৃথিবীর ভার দিয়েছেন এই ছোটদাদার হাতেই।

চরিত্র ঃ বুড়িমা

বুড়িমা তিস্তাপুরাণ-র কেন্দ্রিয় চরিত্র। তাঁর বেঁচে থাকা ও অলৌকিকত্ব নিয়ে উপন্যাসের বিস্তার। তিস্তাপুরাণ একটি আধুনিক পুরাণ। এর ঘটনাবলি আধুনিক। -এর ভাষা আধুনিক। সামাজিকতা, অর্থনীতি আধুনিক। কিন্তু এই আধুনিকতার ভেতর যে পুরাণ, চোরাস্রোতের মতো উপন্যাস খানিকে পুষ্ট করেছে এবং যা মূলত ঘটেছে যাকে কেন্দ্র করে সেই হল বুড়িমা। বুড়িমার বেঁচে থাকা, চলন-বলন, ক্রিয়াকাণ্ড উপন্যাসে এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যা তিস্তাপুরাণের পৌরাণিক আবহ তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতেই বুড়িমাকে দেখানো হয়েছে এক অথর্ব, অতি বয়সী, নিষ্কর্মা, বৃদ্ধা। এককালে সবার খেয়াল সেই রাখত এখন আর কারও খেয়াল রাখে না। এমন ভাবে থাকে যে বাড়িতে যে বুড়িমা আছে তার আলাদা করে কারও খেয়াল থাকে না। 'তার মানে যে বুড়িমা সবার বে খেয়ালে চলে গেছে, তা নয়। খেয়ালেরও

তো একটা ভিতর আছে। সেই ভিতরেরও একটা ভিতর আছে। তারও কোন ভিতর আছে।' বুড়িমা চলে গেছে সেখানে। তাই বুড়িমা টাড়ি বাড়ির — "এই বেটা-বৌ-নাতি-নাতনি-নাতবৌ-নাতজামাই-পুতি, পোতাবৌ, পোতজামাই-বেয়াইয়ের নাতিপুতি—এই জঙ্গলবাড়ি, জলবাড়ি, হাটবাড়ি, রাস্তাবাড়ি, চরবাড়ি, মেঘবাড়ি এই সব কিছুরই মধ্যে মিশে আছে। মিশে আছে, মিশে বেঁচে আছে।" ১০৩

'একেক সময় মনে হয় বুড়িমা সারাটা জীবন একই সঙ্গে বাঁচছে।' বাড়ির কারও জানাই নেই যে বুড়িমার চোখ আছে কিনা, চোখে দেখতে পায় কিনা। এগিনার বাচ্চা প্রহরায় বুড়িমার বদলে কুকুর ভেউলা বেশি বিশ্বাস যোগ্য। বুড়িমা যেন সিন্‌ঝা কাঠির ঠাকুর, কিছু না দেখলেও, কিছু না করলেও যেন সবই সে দেখে, শোনে। বুড়িমার জীবনটা তো উত্তরের ওই পাহাড়ের মতো— গোটাটাই একটা জীবন। কী করে কবে এরকম একটা বিশাল জীবন হয়েছে তা হিসেব করে বলা যায় না। 'বুড়িমার জীবনকেও গোটা একটা নদীও বলা যায়।'

এই বুড়িমা একদিন হারিয়ে যায়। খোঁজার ধুম পড়ে যায়। অবশেষে বড়চিলার বড়ছেলে বড় মুতুরার বৌ, কান্টি, সানঝুর বড় ছেলের ঘরের ঝাঁপের আঁড়াল থেকে বুড়িমাকে বের করে। 'এক ভাদ্রের প্রথম দু-চার দিনের দুপুর নাগাদ, বুড়িমা পাছত-এগিনায় দুখারুর ভিটের সামনে গড়িয়ে এসেছিল। সেখানে দুখারুর পুত বৌ ঢলানি পাড় হচ্ছিল নতুন এগিনা এবং অভ্যাস মত বুড়িমার দিকে তাকাতেই বুড়িমা দুটো আঙুল তুলে তাকে ডাকে। সে ছুটে এসে বুড়িমাকে জড়িয়ে ধরতেই বুড়িমা ফিস ফিসিয়ে বলে—'পাহাড়ের ধসে বান আটকি আছে, পাহাড়ত, উচা পাহাড়ত, বড় বান, বড় বান'। যে বুড়িমা কিছুই দেখে না, সে বহু দূর থেকে অদৃশ্য চোখে কী করে বানা ঝুলে থাকা দেখতে পায়? এ কী অলৌকিকত্ব নয়। কিন্তু এই অলৌকিকতা ডেকে আনে বাস্তবে এক কর্মচঞ্চলতার। বন্যা আসার আশঙ্কায় গোতের লোকজন তাদের বিষয়আশয় রক্ষা করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। শুরু হয় গোলাঘর রক্ষা, গোহালিয়া ঘর রক্ষা, পাটাঘর রক্ষা, শোয়াঘর রক্ষা এবং বুড়িমাকে রক্ষার কাজ। চলে বন্যার জন্য প্রতীক্ষা।

মনে করা হয় বন্যা নেমে গেছে ধান ক্ষেতে, সেখানে সে মাটিতে গোহি, হলরেখা এখনো মিশে যায় নি। 'সে হলরেখা থেকে এই বানা জাগা প্রহরে সেই পুরাণ কন্যা উঠে আসতে পারে।'

"বুড়িমা যখন দেখেছে পাহাড়ে বানা ঝুলে আছে, তখনই তো জানা হয়ে গেছে, বানা নেমেছে, বানা ভেসেছে। তার আবার সাক্ষী সাবুদ কী? বানা ঝোলা দেখা যেমন অলৌকিক ব্যাপার। তেমনি দেখেছিলই যে তারও কোন প্রমাণ নেই। কোন দিন দেখবে হয়তো।"১০৪ 'কেউ কি জানে কোনটা এই জন্মে ঘটেছে। কোনটা

জন্মান্তরে ঘটেছে বা ঘটবে।' সময়ের এই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত একাকার করে দেওয়া পৌরাণিক আবহ তৈরিতে সহায়তা করে।

এখন তো বুড়িমার কত জন্ম বাঁচা চলছে তারই কোন হিসেব নেই, সেই হিসেব কেউ খোঁজেও না। সে হিসেব খুঁজতে পারে এমন লোকজনও নেই। বুড়িমা বাঁচে একটা ফরেষ্টের মত। তার বাঁচার মধ্যে কত জন্ম মৃত্যু মিলে আছে। এই দীর্ঘ বাঁচায় তার ছেলে মেয়ে কত তারও কে হিসেব করবে! 'বুড়িমার যে দশ-বিশ ছেলেমেয়ে সে কি কেউ গুণে গুণে দেখেছে?' নাম দিয়ে, ঢক দিয়েও তো চেনা সম্ভব নয় ছেলে মেয়ে। বুড়িমা কবে থেকে বুড়িমা হয়েছে এটাও হিসেবের মধ্যে পড়ে না। বুড়িমা তার সন্তান জন্মের হিসাবটা নষ্ট করে দিয়ে তার 'গোত', 'সাতগোত' তৈরি করেছে। তাঁর গোতের বিশালতা, বাস্তবতা একমাত্র প্রবাদ দিয়েই বিশ্বাসযোগ্য করা যায়—

"যাক কহিছেন পরের বেটা
উমরা মোর জাতের খোঁটা।
এই বেটাখান মোর, ঐ বেটাখান তোর
সব বেটারই একোখান পেটের ভিতর ঘর।" ১০৫

এভাবেই বাস্তব সম্মত ভাবেই বুড়িমা তার গোতের বৃদ্ধি সম্ভব করে তুলেছে। এই বাস্তবতাই অলৌকিক।

যতদিন যায় সবাই ভাবে বুড়িমা যখন তখন মরে যাবে। কিন্তু যত দিন যায় যত বর্ষা যায়, চাষ যায়, শীত যায় বুড়িমা ততই অমর হয়। ততই সবার ভয় বাড়ে এই বুঝি বুড়িমার অমরতা থেমে যায়। 'যে অমরতা প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু লাঞ্ছিত সে অমরতা টুকুই তো সবাই বাঁচিয়ে রাখতে চায়।' সবার ভয় বুড়িমা একদিন গোত ছেড়ে চলে যেতে পারে। কারণ পূর্ব কোন পুরুষের শিকড় থেকে তো সে আসেনি বা পরের সব পুরুষে বুড়িমা তার শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে তাও নয়। বুড়িমার বেঁচে থাকা বা অমরতা খানিক প্রথম বিয়োনীর মত। জাতকের প্রতিটি কাজ, শ্বাস নেওয়া, দুধের বোঁটা টেনে শ্বাস আটকে হাঁস ফাঁস করা যেন অলৌকিক। বুড়িমাও সেই অলৌকিক।

বুড়িমার বাঁচাকে সবাই অনুভব করে একটু খানি ছোঁয়া দিয়ে। বুড়িমা যেন পুরাণের সাইটোন। মিল ও অমিল দুই নিয়েই বুড়িমার সঙ্গে সাইটোন তুল্য। সাইটোন ছিল জন্মবাঁজা। তার শাশুড়ি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বনবাসে পাঠায়। মা মনসার বর পেয়ে সে স্বামীর ঘরে ফিরে আসে। স্বামীকে তার গোয়ালঘরে নিয়ে

গিয়ে গর্ভসঞ্চার করায়। জন্ম নেয় লবকুশ। একটা বিশাল গোত তৈরি হয়।

বুড়িমা বাঁজা নয়, তাকে বনবাসে পাঠানো হয়নি। এগুলি অমিল। কিন্তু মিলও প্রচুর — সাইটোন দেবীর মতো বুড়িমাও একটি মহাগোত তৈরি করেছে। 'বাঁজা থেকে সাইটোন হওয়া যেমন দেবতার এক কাজ, বুড়িমা থেকে বাঁজা হওয়া তো দেবতার আর এক কাজ। বাঁজা থেকে সাইটোন হওয়ায় তো আনন্দ — স্বামীর সঙ্গে মিলনে আনন্দ, গর্ভধারণের আনন্দ, গর্ভ রাখার আনন্দ, প্রসবের আনন্দ, ছোয়াক দুধ খাওয়ানোর আনন্দ। বুড়িমা থেকে বাঁজা হওয়া তো লজ্জা— স্বামীর সঙ্গে মিলনের লজ্জা, গর্ভধারণের লজ্জা, গর্ভরাখার লজ্জা, প্রসবের লজ্জা, ছোয়াক দুধ খাওয়ানোর লজ্জা। বুড়িমা যাতে লজ্জা না পায়, বনবাসে না যায়, বাঁজা হয়ে না যায় সেই বুড়িমার গায়ে নিজের তাপ ছড়িয়ে দেয়া, তাকে ছোঁয়া, বাতাসের আওয়াজকে বুড়িমার ডাক বলে ভুল করা। বুড়িমাকে বাঁচিয়ে রাখা।' এভাবেই বুড়িমার বাঁচা — আর গোতের বাঁচা এক হয়ে যায়। এভাবেই প্রায় মৃত বুড়িমা সবার হাতের ছোঁয়ায় আরও বেশি করে বাঁচছে।

জন্ম জন্মান্তরের বুড়িমা। জন্মান্তরে যা ঘটে সে তো জন্মেরই ভিতর। জন্মও যে চলতে থাকে সেও তো জন্মান্তরেরই সঙ্গে সঙ্গে। 'বুড়িমা সেই জন্মটা ধরে রেখেছে। তার স্বামী সংসারে জন্ম, ছোয়াপোয়ার জন্ম, ছেয়াছোটর জন্ম, এই গাও-ক্ষেতবাড়ি, দশনদী-বিশনদী, তিস্তানদীর পার, ফরেস্ট ঘেরা কত গাঁওয়ের জন্ম। তার গোতের বড় ছোট সবাই বুড়িমার জন্ম ও জন্মান্তরের সঙ্গে যুক্ত। বুড়িমা বুড়ি হয়েছে বলে বুড়িমা নয়। 'বুড়িমা তার বেঁচে থাকাটাকে এক জন্মান্তরের বেঁচে থাকার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে যে বুড়িমা থেকেই একটা গোত তৈরি হয়ে গেছে।' সাধারণত গোত তৈরি হয় পরে, অনেক পরে। কারণ তাকে নিয়ে কল্পনা করা যায়, সেই কল্পনায় অন্যদের বিশ্বাস করানো যায়। বুড়িমার বেলায় কিন্তু তেমন হয়নি। বুড়িমা জানেই না তাকে নিয়ে গোত তৈরি হয়েছে। যারা বুড়িমাকে কম দেখেছে, কম চিনেছে, তাদের কাছে বুড়িমা বেশি সত্য। মানুষের বাঁচার জন্য একটা আত্মপরিচয় দরকার। বুড়িমা সেই আত্মপরিচয়। শুধু কি মানুষ, জমির দাগ নম্বর, আর পঞ্চায়েতের সীমানা নিয়ে বাঁচতে পারে? বুড়িমার পরিচয়ে একটা গোতের কল্পনায় বুড়িমা হয়ে উঠেছে গোত্রনারী।

বিস্মরণ বুড়িমার বুড়িমা হয়ে ওঠার আর এক ধাপ। কারণ, 'বিস্মরণে সবই স্মরণ'। গোতের সবাই বুঝে নিয়েছিল - এমন বিস্মরণ যাত্রায় বাধা দিতে নেই। 'বিসারু ও ভুলে গেছে — সে বুড়িমার ছেলে কী না।' বুড়িমা নিজে ভুলে গিয়ে তার ছেলেকেও ভুলিয়েছে। তেমন বিস্মরণ ব্রত থেকেই তো গোত্র জেগে ওঠে,

তিস্তার জল থেকে চরের মত।'

'বুড়িমার মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু গোতের লোকেরা বুড়িমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় নিজেদের উৎকণ্ঠা দিয়ে, আকাঙ্খা দিয়ে, নিজেদের শরীরের তাপ বুড়িমার শরীরে সঞ্চারিত করে।' বুড়িমা মরল না, বেঁচেও থাকল না —কোথাও উধাও হয়ে গেল বা হাওয়ায় মিশে গেল, সেই ভয় সেই বুড়িমার গোতকে সব সময় তাড়া করে। বুড়িমার মৃত্যু নেই কিন্তু প্রস্থান থাকতে পারে। সে এমন প্রস্থান যা পাহারা দেয়া যায় না।

বুড়িমার গোতে যখন নানা পরিবর্তন এসেছে - নতুন পিচের রাস্তা হয়েছে, বুড়িমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে, বাড়ির মেয়েরা এমনকি বৌয়েরাও শহুরে দিদিমণির মত শাড়ি পড়া শুরু করেছে - তখন এক ভাদ্রের প্রথমে দু'একদিনের দুপুর নাগাদ যখন দুখারুর পুতবৌ ঢলানী নতুন এগিনা পার হচ্ছিল এবং অভ্যেস মত বুড়িমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিল তখন সে দেখতে পায় বুড়িমা বাঁ হাতটা তুলে ঢলানীকে ডাকছে। ঢলানী, আয়ী, আয়ী শব্দ করে বুড়িমার কাছে ছুটে গিয়ে বসলে বুড়িমা যেন ফিস ফিসিয়ে বলে 'তিস্তার চরত হাতি ডুবি যাওয়ার ধরিছে। সেবা দে, সেবা দে।' বলেই বুড়িমা আবার স্থবির হয়ে যায়।

বুড়ি যেমন অদৃশ্য চোখে বানা ঝোলা দেখে, তেমন তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়াও দেখতে পায়। তিস্তার জলে হাতি ভেসে যাওয়াটা, অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বুড়িমা তো তিস্তায় বলে নি, বলেছে তিস্তার চরে। ভেসে যাওয়ার কথাও বলেনি, বলেছে ডুবে যাচ্ছে। বুড়িমার কথা নানা ব্যাখ্যা করতে চাইলেও অবশেষে তার কথাতেই ফিরে আসে। 'বুড়িমা যখন বলেছে তখন হাতি নিশ্চয় ডুবছে। বুড়িমা যদি বলত, তাহলে হাতি উড়ত।' এমন বিশ্বাস বুড়িমা অর্জন করেছে।

বুড়িমার গোতে যখন সবদিক থেকে উন্নয়নের ঢেউ, পরিবর্তনের পরিবেশ, তখন বুড়িমার তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়া দেখা কোন অর্থ বহন করে। এরকম একটা হাতি সত্যি সত্যি তিস্তার চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার ঘটনা লেখক জানেন। একান্ত আলোচনায় তিনি তা সন্দর্ভকারকে বলেছেন। সে দিক থেকে ঘটনাটির একটি বাস্তব ভিত্তি আছে। কিন্তু উপন্যাসে সেই হাতি ডোবার ঘটনা এনে বুড়িমার গোতের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার পেছনে মনে হয় এই নব উন্নয়ন ডুবে যাওয়ার ইঙ্গিত— যা পরে ছোটদাদাও অস্বীকার করে সত্যিকারের সমাজ পরিবর্তনের জন্য 'ক্ষিধার পাকে' চলে গেছে।

সত্যকে অনেক সময় অস্পষ্ট ও অলৌকিক বলে মনে হয়। কিন্তু সময়, সত্যের সেই অস্পষ্টতা, অলৌকিকতা মুছে দিয়ে বাস্তবের আলোয় ভাস্বর করে তোলে। বুড়িমার দেখা তিনটি অলৌকিক ঘটনার পেছনে আসলে

বাস্তব সত্য নিহীত আছে।

বুড়িমার শেষ অলৌকিকতা হলো - যখন ছোটদাদা বুড়িমার গোতে নইদারিঘরে শুয়ে স্বপ্নের ঘোরে আদিষ্ট হয়- 'ক্ষিধার পাকে' চলে যেতে এবং সেই দিন ফিরে আসবে যেদিন ' মানষির হাতের ফলন মানষির পেটের ক্ষিধা মুখত নিগিবার' দরকার হবে, এবং যখন পাহাড়ে ঝুলে থাকা বানা এবং তিস্তার চরে ডুবে যাওয়া হাতি পাতাল ফুঁড়ে পাখা মেলে উড়ে আসবে। একথা জানার পর পুরনো বাহির এগিনায় ছোটদাদা পা দিতে গেলেই বুড়িমা কোন একটা আঙুল তুলে তাকে ডাকে, "মোক নিগি যা পিঠত বুকুনি বান্ধি। তিস্তার জলত মোর বিসর্জন দে, মোর তিস্তাত ভাসি দে।" ১০৬ ছোটদাদা নিয়ে চলে। ডানে ঘোরে বাঁয়ে ঘোরে। ভেউলা তার পশু-অনুভবে কী যেন টের পায়। ছোটদাদা বড়বাঁক, কুলজুয়া, দুদুয়া, গরাতি, নোমাই, গোলুন্দি, আংরাভাসা, জলঢাকা করে অবশেষে তিস্তায় চলে যায় ক্ষেতের ফলন মানুষের ক্ষিধের কাছে তুলতে তুলতে। ছোটদাদা যে পথে গেছে সেই পথেই তিস্তা, জলঢাকা ইত্যাদি করে শেষে বড়বাঁকে বুড়িমার গোতে ফিরবে। হয়তো ফেরার পথের সময় হতে পারে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, তিন চার মানবজন্মও হতে পারে।

বিসর্জন—এক পুরাণের শেষ, আর এক পুরাণের শুরু। পুরোনো ব্যবস্থা, জোত, গোত, বিশ্বাস-বিসর্জিত হয়ে—ছোটদাদার পুনর্বাসনে নতুন ব্যবস্থা আসবে। তাতে তথা কথিত উন্নয়ন নয়, সত্যিকারের ক্ষুধার নিবৃত্তির বা মানবমুক্তির আশ্বাস থাকবে। বুড়িমা নিজেকে তিস্তার জলে বিসর্জিত করে তিস্তা সংলগ্ন জীবনের নব উত্থানের ঘোষণা করে গেল।

তিস্তাপুরাণের স্বরূপ বিচার করে দেখা গেল এই উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ ভাবেই মহাকাব্য লক্ষণ যুক্ত। এখানেও একটি বিশেষ অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের নানা দিক নিখুঁত ও নিপুণ ভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানেও একটি বিশেষ অঞ্চলের কথা বলা হলেও বক্তব্য, অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করে সর্বমানবের কথা হয়ে উঠেছে। এখানেও রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস — উপন্যাস খানিকে বিভিন্ন শ্রেণির লক্ষাভিমুখী করতে চাইছে। কিন্তু তিস্তাপুরাণ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-র মতোই এক মহাকাব্য ।

পুরাণের মত এ উপন্যাসেও আছে একটি সম্প্রদায় বা জাতির বংশ পরিচয়, নামকরণ, জন্মমৃত্যু সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতি, পূজাপার্বণ চাষবাস, জমিদখল, উচ্ছেদ, নির্বাসন, অলৌকিকতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ধ্বংস আবার নব সৃষ্টির উদ্যম ও উল্লাস, একটি জনগোষ্ঠী কীভাবে এক বুড়িমা থেকে বিশাল গোতে পরিণত হল,

কীভাবে তাদের দৈনন্দিন অতিবাহিত হল, ক্রমে জরা, ব্যধি আক্রান্ত হয়ে কেউ কেউ মরণের দিকে চলে গেল, কী করে চাষ আবাদে, জীবন যাপনে, শিক্ষা সংস্কৃতিতে পুরাতন সরে গিয়ে নতুন জায়গা করে নিল, অবশেষে পুরাতন কীভাবে নতুনের কাঁধে চেপে বিসর্জনে চলে গেল। এক পুরাণ শেষ হয়ে আর এক পুরাণ জন্ম লাভ করল এত সব ব্যাপার যে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তাকে মহাকাব্য ছাড়া কী বলা যায়।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ' এর মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে দেবেশ রায় তিস্তাপুরাণের ভূমিকায় বলেছেন- ' একটি কথা স্পষ্ট করে রাখায় দায় বোধ করছি। এই উপন্যাসটি কোন ভাবেই আমার 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র পরবর্তী কোন অংশ নয়— ঘটনায় ও মানুষজনে তো নয়ই, গল্পের গড়ন পেটন বা হদিশ নিশানাতেও নয়। সহজ করে নেয়ার কোন ত্বরিত সুবিধেয় বা কঠিন করে তোলার কোন সামর্থে ও রকম ভেবে নিলে দুটি লেখারই স্বায়ত্ব স্বাতন্ত্রের হয়তো ক্ষতি ঘটতে পারে।'

লেখকের এই কথা গুলো মনে রেখেই দুটি উপন্যাসের একটি তুলনা মূলক আলোচনা সংক্ষেপে করা গেল।

- তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ উভয়ই এপিসোডিক উপন্যাস।
- তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ম্যাপ ও তিস্তাপুরাণে বংশ তালিকা আছে।
- তিস্তাপারের বৃত্তান্ত মূলত রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর আধারিত।

'তিস্তাপুরাণ' - এ রাজনীতি এসেছে সমাজ মানুষের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে।

- উভয় উপন্যাসের বহু চরিত্রের সমাবেশ। নারী চরিত্র তিস্তাপারের বৃত্তান্তে প্রধানত একটি - মাদারির মা। শ্রীদেবী, ধর্ষিতা মেয়েটি এবং বাঘারুর মা, গয়ানাথের স্ত্রী ও মেয়ে এবং বন্যার আশঙ্কায় বাঁধে অবস্থানকারী কিছু নারী যাদের ভূমিকা উপন্যাসে একেবারেই নগণ্য।

কিন্তু তিস্তাপুরাণ-এ বুড়িমা ছাড়াও অসংখ্য নারী চরিত্র যারা উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- তিস্তাপারের বৃত্তান্তের বাঘারু ও তিস্তাপুরাণের ছোটদাদা উভয়েই সর্বহারা, বাঘারুর কোন পিতৃপরিচয় নেই, ছোটদাদা ঢেমনার ছেলে। এক অর্থে দু'জনেই জারুয়া বা জারজ। বাঘারু গয়ানাথের মানষি, ছোটদাদা বুড়িমার গোতে পেটে ভাতে চাকর তুল্য। উভয়েই নির্বাসিত হয়েছে। নির্বাসনের কারণ উভয়েরই জমির অধিকার চাওয়া। বাঘারুর ক্ষেত্রে এটা মিথ্যা আরোপ। বরং বাঘারু আপলচাঁদে স্বেচ্ছায় তার জমির স্বত্ব

ছেড়ে দিয়েছে। ছোটদাদা নিজে জমির দখল নিতে গেছে, পরে অবশ্য ছোটদাদাও তাকে দেওয়া স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছে।

বাঘারুর কোন মানসিক বিকাশ নেই। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানসিকতায় একই রকম। সে কংগ্রেস নয়, কমিউনিস্ট নয়, উত্তরখণ্ডী নয়, রাজবংশী নয়, ভাটিয়া নয় — শুধুই বাঘারু। কিন্তু ছোটদাদা প্রথম দিকে কিছুটা উদাসীন হলেও ধীরে ধীরে সে কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অধিকার সচেতন ও দায়িত্ব পরায়ণ হয়ে উঠেছে। উভয়েই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাঘারু করেছে ব্যারেজ নির্মিত তিস্তার রূপ দেখে, উন্নয়নের ছোঁয়া লাগা বন দেখে। সেখানে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না বলে, আর ছোটদাদা করেছে এ উন্নয়নে ধনতন্ত্রের ছায়া দেখতে পেয়েছে- যা মানব মুক্তির অন্তরায়।

■ উভয় উপন্যাসে বন্যার কথা আছে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বন্যা ভয়ঙ্করী রূপে আর তিস্তাপুরাণে বন্যা পাহাড়ে ঝুলে থাকা অবস্থায়। এক জায়গায় বন্যা বাস্তবে, আর এক জায়গায় বন্যা কল্পনায়।

■ উভয় উপন্যাসেই কুকুর একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ভোখা, আর তিস্তাপুরাণে 'ভেউলা'। বাঘারুর ডায়না চরে নির্বাসনে যাওয়ার পথে সঙ্গী ভোখা এবং বুড়িমার অন্তিম যাত্রায় সঙ্গী ভেউলা যেন মহাভারতের পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথের কুকুররূপী ধর্ম।

■ উভয় উপন্যাসেই নদী — তিস্তা। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তিস্তা ছাড়াও ডায়না, তোর্সা, গয়েরকাটা ও অন্যান্য নদীর কথা আছে। তিস্তাপুরাণেও তিস্তা ছাড়া বড়বাঁক, নোমাই, গড়াতি, আংরাভাসা, দুদুয়া ইত্যাদি অসংখ্য নদী।

■ উভয় উপন্যাসে নদীতে নৌকা আছে — তবে কোথাও খেয়া পারাপার বা মাছধরার জন্য নয়। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে — নৌকা বাঘারু উদ্ধারের কাজে লেগেছে, আর তিস্তাপুরাণে ঘাটোয়াল নদী চেনার জন্য নৌকায় করে এ নদী সে নদীতে ভেসে অবশেষে তিস্তায় নেমেছে।

■ উভয় উপন্যাসেই প্রেমের কোনো উল্লেখ নেই।

উল্লেখপঞ্জি

১। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৪০।

২। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০১, কলকাতা, পৃঃ ১৫।

৩। তদেব পৃঃ ১৪-১৫

৪। তদেব পৃঃ ১৫১

৫। তদেব পৃঃ ১৮৭

৬। তদেব পৃঃ ৬৮-৬৯

৭। তদেব পৃঃ ৩৬৬

৮। তদেব পৃঃ ২৯

৯। তদেব পৃঃ ৩৪-৩৫

১০। তদেব পৃঃ ৮১

১১। তদেব পৃঃ ১৩১

১২। তদেব পৃঃ ১৪৮

১৩। তদেব পৃঃ ২৩৪

১৪। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৫২

১৫। A Glossary of Contemporary Literary Theory, Jeremy Hawthorn, Fourth edition, 2000. P.266-67

১৬। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮৮, পৃঃ ৩৯

১৭। তদেব পৃঃ ২০৯-২১০

১৮। তদেব পৃঃ ২৮৯-৯০

১৯। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ১৬৩

২০। তদেব পৃঃ ১৯

২১। তদেব পৃঃ ১৮৯

২২। তদেব পৃঃ ১৫৭

২৩। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ১৯৫-৯৬

২৪। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ১৮৩

২৫। তদেব পৃঃ ১৮৪

২৬। তদেব পৃঃ ১৮৪

২৭। তবেদ পৃঃ ১৮৪

২৮। তদেব পৃঃ ১৮৪

২৯। তদেব পৃঃ ১৮৫

৩০। তদেব পৃঃ ১৮৫

৩১। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ১২৭

৩২। উপন্যাস জিজ্ঞাসা, রবীন্দ্রগুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, ১৯৯৫, পৃঃ ৮

৩৩। A Dictionary of Literary Terms, J.A.Cuddon, Double day and Company Inc, Gardencity, Newyork 1976, P-560

৩৪। সাহিত্য কোষ কথা সাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্য লোক, ২০০২, পৃঃ ৩

৩৫। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃঃ ২০০।

৩৬। তদেব পৃঃ ৯৫

৩৭। তদেব পৃঃ ১২১

৩৮। তদেব পৃঃ ১৫৮

৩৯। তদেব পৃঃ ৪৮

৪০। তদেব পৃঃ ১৫১

৪১। তদেব পৃঃ ২০০

৪২। তদেব পৃঃ ৪৩৩

৪৩। তদেব পৃঃ ৪৩৫

৪৪। তদেব পৃঃ ৪৪৯

৪৫। তদেব পৃঃ ৪৭৮

৪৬। বাংলা উপন্যাস ঃ দ্বান্দ্বিক দর্পণ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০মে ১৯৯৬, পৃঃ ১০৫

৪৭। তদেব পৃঃ ১০৫

৪৮। তদেব পৃঃ ৩৪৮

৪৯। বঙ্গীয় শব্দ কোষ দ্বিতীয় খন্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি ১৯৬৬, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, পৃঃ ১৩৪৫

৫০। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, গুণবাজ খান, মালাধর বসু বিরচিত-সম্পাদনা অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গলা রানা, রত্নাবলী প্রকাশনা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৩৩-৩৪

৫১। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০, পৃঃ ৬৯৬

৫২। তদেব পৃঃ ৬৩৮

৫৩। তদেব পৃঃ ২৭৯

৫৪। তদেব পৃঃ ৩০৩

৫৫। তদেব পৃঃ ২৭৯

৫৬। তদেব পৃঃ ১৭৪

৫৭। তদেব পৃঃ ৩০

৫৮। তদেব পৃঃ ৩০-৩১

৫৯। তদেব পৃঃ ৩৩

৬০। তদেব পৃঃ ৫২

৬১। তদেব পৃঃ ৬১

৬২। তদেব পৃঃ ২৯

৬৩। তদেব পৃঃ ১৯২

৬৪। তদেব পৃঃ ১৯৩

৬৫। তদেব পৃঃ ৫২

৬৬। তদেব পৃঃ ৭০

৬৭। তদেব পৃঃ ২৩৮-৩৯

৬৮। তদেব পৃঃ ২৪২

৬৯। তদেব পৃঃ ২২৮

৭০। তদেব পৃঃ ২৩০

৭১। তদেব পৃঃ ৬৩

৭২। তদেব পৃঃ ৭৫

৭৩। তদেব পৃঃ ১৯৩

৭৪। তদেব পৃঃ ৮৬

৭৫। তদেব পৃঃ ৪০২

৭৬। তদেব পৃঃ ৪০৬

৭৭। তদেব পৃঃ ৪৮৪

৭৮। তদেব পৃঃ ৪৮৫

৭৯। তদেব পৃঃ ৫৩৩-৩৪

৮০। তদেব পৃঃ ১৮৬

৮১। তদেব পৃঃ ১৮৭

৮২। তদেব পৃঃ ১৮৮

৮৩। তদেব পৃঃ ৪৭৩

৮৪। তদেব পৃঃ ৪৭৩

৮৫। তদেব পৃঃ ৪৭৪

৮৬। তদেব পৃঃ ১৫৬

৮৭। তদেব পৃঃ ২৩৩

৮৮। তদেব পৃঃ ৮৩-৮৪

৮৯। তদেব পৃঃ ২৪৪

৯০। তদেব পৃঃ ২৮৯

৯১। তদেব পৃঃ ৪৪৩

৯২। তদেব পৃঃ ৫৬৩

৯৩। তদেব পৃঃ ৬১১

৯৪। তদেব পৃঃ ১৮৫

৯৫। তদেব পৃঃ ৪৯৪

৯৬। তদেব পৃঃ ৩৭৩

৯৭। তদেব পৃঃ ৩৮৪

৯৮। তদেব পৃঃ ৪২৭

৯৯। তদেব পৃঃ ৪৪৪

১০০। তদেব পৃঃ ৪৬১

১০১। তদেব পৃঃ ৬৯২

১০২। তদেব পৃঃ ৬৯৬

১০৩। তদেব পৃঃ ২৩

১০৪। তদেব পৃঃ ৮১

১০৫। তদেব পৃঃ ১৭৭

১০৬। তবেদ পৃঃ ৬৯৬